HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ০১ ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ও প্রক্রিয়া

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ও প্রক্রিয়া
টপিক ০২: লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) এবং ইলবার্ট বিল
টপিক ০৩: লর্ড কার্জন
টপিক ০৪: স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং আলীগড় আন্দোলন
টপিক ০৫: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
টপিক ০৬: মুসলিম লীগ
টপিক ০৭: লক্ষ্ণৌ চুক্তি
টপিক ০৮: খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন
টপিক ০৯: সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট
টপিক ১০: জিন্নাহর চৌদ্দ দফা
টপিক ১১: গোলটেবিল বৈঠক

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন
টপিক ১৩: লাহোর প্রস্তাব
টপিক ১৪: মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা
টপিক ১৫: ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন
টপিক ১৬: পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়
টপিক ১৭: অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা
টপিক ১৮: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৯: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: পেশার ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ও প্রক্রিয়া

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি রচিত হয়। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হলে তাদের সে ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়। এরপরের একশ বছর ছিল ভারতে ইংরেজদের উত্থানের পর্ব। তবে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে ইংরেজদের ক্ষমতার ভিত কেঁপে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে, একটি সাধারণ বাণিজ্যিক কোম্পানির মাধ্যমে ভারতের মতো বিশাল অঞ্চল কার্যকরভাবে শাসন করা আর সম্ভব নয়। এজন্য ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে একে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর শুরু হয় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। এ পর্বে আমরা দেখবো, ভারতের জনগণের মধ্যে কী করে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং কীভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়েছিল।

১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ও প্রক্রিয়া

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রক্রিয়ায় ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ব্যাপক ও যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। কারণ ১৮৫৭সালের সিপাহি বিপ্লব উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এ বিদ্রোহ দমন করতে বেশ বেগ পেয়েছিল। সিপাহি বিপ্লবের ঘটনায় ব্রিটেনের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হাতে ভারতের মতো বিশাল উপনিবেশের শাসনভার রাখা ঠিক নয়। এজন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন (Lord Palmerston) ব্রিটেনের পার্লামেন্টে The Government of India Act 1858 নামে একটি বিল উত্থাপন করেন। একই বছর আগস্টের ২ তারিখে তা পাস হয়। এর মাধ্যমে ব্রিটেনের মহারানি ভিক্টোরিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের শাসনব্যবস্থা সরাসরি নিজ হাতে গ্রহণ করেন। রানি ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত করেন। এ সংক্রান্ত ঘোষণার মাধ্যমে মহারানি ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজাসাধারণের ক্ষোভ ও দুঃখ প্রশমনের লক্ষ্যে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস প্রদান করেন।

১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ও প্রক্রিয়া

১৮৫৮ সালের সনদে নিম্নরূপ বিধানের কথা বলা হয়েছিল:

১. এখন থেকে কোম্পানিশাসিত ভারতের শাসনের কর্তৃত্ব ব্রিটিশ সরকারের হাতে থাকবে এবং ব্রিটিশ রানির নামে তা পরিচালিত হবে।

২. এখন থেকে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ব্রিটেনের রানির মুখ্য সচিবের (Principal Secretary of State) হাতে দেওয়া হবে। তাকে সাহায্য করার জন্য ১৫ সদস্যের একটি কাউন্সিল নিয়োগ দেয়া হবে। ভারত সরকার এবং ব্রিটেনের সরকারের সাথে সব রকম যোগাযোগের প্রকৃত মাধ্যম হবেন এই মুখ্য সচিব। কাউন্সিলটি হবে ভারতবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির মত। মুখ্য সচিবকে উপদেষ্টা কাউন্সিলের মতামত ছাড়াই সরাসরি গোপন নির্দেশনা দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়।

৩. মুখ্য সচিবের নিয়ন্ত্রণে একটি সিভিল সার্ভিস গঠনের কথা বলা হয়।

৪. ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসরণ করবে।

৫. ভারতীয় জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে, নতুনভাবে কোনো ধর্মীয় সংস্কার নীতি চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

৬. লর্ড ডালহৌসি প্রবর্তিত সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হবে।

১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ও প্রক্রিয়া

৭. সামন্তপ্রভুরা ইচ্ছা করলে পুত্রসন্তান দত্তক নিতে পারবেন।
৮. আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মতামত নেওয়া হবে।
৯. ভারতীয়দের ওপর কোনো অবস্থাতেই খ্রিষ্টধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হবে না, অর্থাৎ ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভারতীয়দের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।
১০. দেশীয় রাজ্যগুলোকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুমতি নিতে হবে।
১১. ভারতীয় যেসব কোম্পানি ও রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।
১২. ভারতীয়দের যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী সরকারি চাকরি দেয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি চাকরি দানের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণগত বিভেদ ও বৈষম্য বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।
১৩. ভারতীয় জনগণের উন্নতির জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ও প্রক্রিয়া

মহারানি ভিক্টোরিয়ার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-৬২) ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েই উদারতা ও শান্তির নীতি অনুসরণ করে ভারতের জনসাধারণের ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করেন। পাশাপাশি আইন, সামরিক, রাজস্ব ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজে হাত দেন। তবে এসব ইতিবাচক সংস্কার সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ শক্তির সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সতর্ক হয়ে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। একদিকে তারা মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে দমনের নীতি গ্রহণ করে, অন্যদিকে নিজেদের ক্ষমতা সংহত করতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানোর কৌশল গ্রহণ করে। ব্রিটিশদের এ নীতিতে কাজ হয়। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পেলে উপমহাদেশ শেষ পর্যন্ত ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্তির পথে এগিয়ে যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ০২ লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) এবং ইলবার্ট বিল

টপিক ০২: লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) এবং ইলবার্ট বিল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) এবং ইলবার্ট বিল

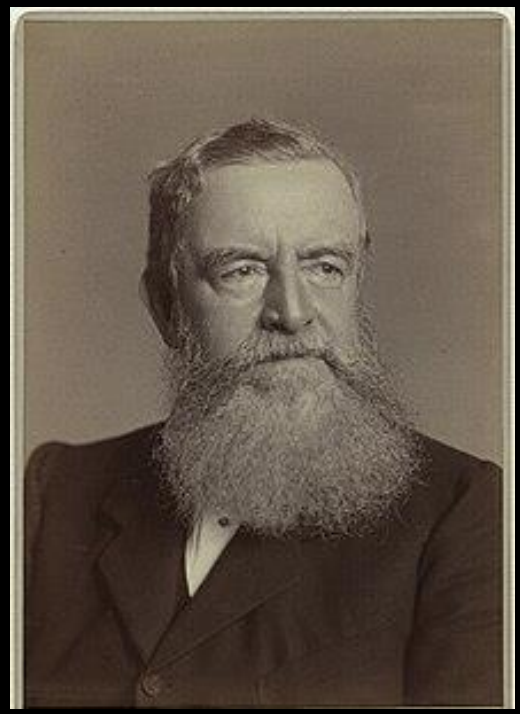

লর্ড রিপন (George Frederick Robinson Ripon) তার উদারনৈতিক শাসনের জন্য সুপরিচিত। ভারতে আসার আগে লর্ড রিপন ১৮৫২ থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের (William Ewart Gladstone) উদারনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৮৮০ সালে লর্ড লিটনের পদত্যাগের পর তিনি ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন।

লর্ড রিপন সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরোধী ছিলেন। এজন্য তিনি ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে রাজনীতির ক্ষেত্রে উদারনীতি অবলম্বন করে জনসাধারণকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে উৎসাহিত করেন। এভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লর্ড রিপন একজন উদারপন্থি ও শান্তিপ্রিয় শাসক হিসেবে ভারতবাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেন।

লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) এবং ইলবার্ট বিল

লর্ড রিপনের গৃহীত সংস্কারমূলক কাজ

লর্ড রিপন তার সংস্কার কার্যক্রমের জন্যই অধিক পরিচিত। তার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য সংস্কারমূলক কাজগুলো ছিল নিম্নরূপ-

১. ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন পূর্ববর্তী ভাইসরয় লর্ড লিটনের আফগান নীতি সংশোধন করা হয়। এজন্য লর্ড রিপন ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েই আফগান সীমান্ত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করেন। তিনি কাবুলে ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। শের আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমানকে আফগানিস্তানের আমির হিসেবে স্বীকার করে রিপন তার সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। এমনকি লর্ড বেন্টিংকের সময় মহীশূর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও ১৮৮১ সালে রিপন রাজ্যটি মহীশূরের হিন্দু রাজবংশের কাছে হস্তান্তর করেন।

২. ১৮৮২ সালে রিপন তার পূর্ববর্তী ভাইসরয় লর্ড লিটন কর্তৃক প্রবর্তিত বিধিনিষেধমূলক 'সংবাদপত্র আইন' (Vernacular Press Act) রহিত করে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে মতামত প্রকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন।

লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) এবং ইলবার্ট বিল

লর্ড রিপনের গৃহীত সংস্কারমূলক কাজ

৩. ভারতীয় জনগণকে আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তোলা ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে লর্ড রিপন উডস ডেসপ্যাচ (Wood's Despatch) এর সুপারিশের আলোকে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, যা হান্টার কমিশন (Hunter Commission) নামে পরিচিত। এ কমিশন ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে গণশিক্ষা কর্মসূচির সুপারিশ করে।

লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) এবং ইলবার্ট বিল

লর্ড রিপনের গৃহীত সংস্কারমূলক কাজ

৪. হান্টার কমিশনের সুপারিশক্রমে তিনি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেন। সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা- এই দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করে এ কমিশন। ভারতে নারীশিক্ষার করুণদশা লক্ষ করে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসনকে নারীদের জন্য অন্তত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে হান্টার কমিশন।

৫. লর্ড রিপনের একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার হলো ১৮৮২ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক আইন (Bengal Municipal Act) প্রণয়ন। এ আইনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে জেলা বোর্ড এবং লোকাল বোর্ড গঠিত হয়। অর্থাৎ জনগণকে পৌরসভা পরিচালনার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণমূলক ব্যাপারেও ক্ষমতা পায় জনসাধারণ। এসব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত উভয় সদস্যের মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে লর্ড রিপন ভারতবাসীর হৃদয়ে গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শকরূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) এবং ইলবার্ট বিল

লর্ড রিপনের গৃহীত সংস্কারমূলক কাজ

৬. লর্ড রিপন ভারত ত্যাগ করেন ১৮৮৪ সালে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকর হয় ১৮৮৫ সালে। তার ভারত ত্যাগের পরে কার্যকর হলেও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (Bengal Tenancy Act) তার শাসনামলেরই একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। কারণ, বাংলা ও অযোধ্যার রায়তদের অবস্থার উন্নতির জন্য লর্ড রিপন তার শাসনকালে এ আইন প্রণয়নের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন।

৭. ভারতীয় জনসাধারণের উপকারার্থে লর্ড রিপন অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে লবণ ও অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্যের ওপর শুল্ক হ্রাস করেন এবং আয়কর রহিত করেন।

৮. ১৮৮১ সালে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য পাসকৃত 'ফ্যাক্টরি আইন' লর্ড রিপনের এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এটি ভারতে এ সংক্রান্ত প্রথম আইন। এই আইনের মাধ্যমে সাত বছর বয়সের কম বয়সী শিশুদের কারখানায় কাজ করা নিষিদ্ধ করা হয়।

৯. শিল্পশ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় নির্ধারণ করা হয় ৮ ঘণ্টা। ফ্যাক্টরি আইনে কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি এ আইন যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য কারখানা পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়।

লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) এবং ইলবার্ট বিল

ইলবার্ট বিল

ইলবার্ট বিল প্রণয়ন লর্ড রিপনের শাসনামলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। এ বিলের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য নিরসনে সচেষ্ট হন। প্রচলিত ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসারে কোনো ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ইতোপূর্বে ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করতে পারতেন না। এটি বিচারবিভাগে কর্মরত ভারতীয় বিচারকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। তাই লর্ড রিপন 'ইলবার্ট বিল' প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতীয় বিচারকদের সে ক্ষমতা প্রদান করেন। এ বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের মধ্যে তীব্র আলোচনা শুরু হয়। তারা এ বিলের বিরোধিতা করার জন্য ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন (Defence Association) নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে এবং এর কাজ চালাতে তখনকার দিনেই প্রায় দেড় লাখ রুপি চাঁদা সংগ্রহ করে।

ইউরোপীয়দের প্রবল বিক্ষোভের ফলে শেষ পর্যন্ত সরকার এ বিল সংশোধন করতে বাধ্য হয়। সংশোধিত বিলে বলা হয়: ভারতীয় বিচারকরা জুরির মাধ্যমে ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করবেন এবং এ জুরিদলের মধ্যে অর্ধেক বিচারক হবেন ইউরোপীয়। ইলবার্ট বিল নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটাতে অবদান রাখে।

লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) এবং ইলবার্ট বিল

ইলবার্ট বিল

লর্ড রিপন ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত ত্যাগ করার পর ৮১ বছর বয়সে ১৯০৯ সালে স্বদেশে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারে দায়িত্বপালনকারী শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। এজন্য ভারতীয়দের কাছে তিনি ছিলেন 'Ripon the Good', ভারতীয় বিচার বিভাগে বর্ণবৈষম্যমূলক আইনের সংশোধন প্রচেষ্টা, ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট রহিতকরণ, স্থানীয় শাসনে ভারতীয়দের সম্পৃক্তকরণ, মহীশূরের হিন্দু রাজবংশকে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া প্রভৃতি তাকে ভারতীয়দের মনে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ০৩ লর্ড কার্জন

টপিক ০৩: লর্ড কার্জন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

লর্ড কার্জন

ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জনকে (George Nathaniel Curzon) ভারত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি পাণ্ডিত্যের অধিকারী মনে করা হয়। তিনি মাত্র ৪০ বছর বয়সে ভারতের ভাইসরয় পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ উপনিবেশ ভারতে এর আগে এত কম বয়সে আর কেউ ভাইসরয় নিযুক্ত হননি।

ভারতে নিয়োগ পাওয়ার আগেও কার্জন এখানে চারবার এসেছিলেন। তিনি তরুণ বয়সে ইরান, তুর্কমেনিস্তান, শ্রীলংকা, কোরিয়া, চীন ও জাপান ভ্রমণ করেছিলেন। ওই দেশগুলো নিয়ে লেখা বেশ কয়েকটি বই তাকে ব্রিটেনের একজন বিশিষ্ট বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষক হিসেবে মর্যাদা এনে দেয়।

লর্ড কার্জন

এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেছেন (১৮৮৬)। তিনি ১৮৯১-৯২ সালে ভারতের জন্য পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি এবং পরে ১৮৯৫-৯৮ সালে ফরেন আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী স্যালিসবেরি (Marquess of Salisbury) তাকে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়-এর পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে কার্জন একই সঙ্গে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হন। লর্ড ওয়েলেসলি এবং লর্ড ডালহৌসির সময় ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করা। কিন্তু লর্ড কার্জনের সময় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংকট কাটিয়ে এটিকে শক্তিশালী উপনিবেশে পরিণত করাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উদ্দেশ্য ছিল। কার্জন বুঝেছিলেন, ব্রিটেনের অর্থনীতির সমৃদ্ধি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থিতি ও সমৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল।.

লর্ড কার্জন পর পর দুবার ভারত সাম্রাজ্যের অধিকর্তা ছিলেন। তার প্রথমবারের শাসনকালকে (১৮৯৯-১৯০৪) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। গৌরবের মধ্য দিয়েই কার্জনের এ শাসনকালের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয়বার ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে মাত্র এক বছরের মাথায় তিনি পদত্যাগ করেন। প্রশাসনিক বিষয়ে কার্জনের গৃহীত ব্যবস্থা নিয়ে তার সঙ্গে ভারতীয় সামরিক প্রধান লর্ড কিচেনারের সঙ্গে বিরোধ হয়। ব্রিটিশ সরকার কিচেনারের পক্ষ নিলে সম্মানজনক সমাধানের পথ হিসেবে লর্ড কার্জন পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

লর্ড কার্জন অত্যন্ত রক্ষণশীল একটি পরিবার থেকে এসেছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন খুব রক্ষণশীল মানসিকতার। কার্জন মনে করতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন শাসক হিসেবে তাকে অত্যন্ত শক্তহাতে শাসন করতে হবে। প্রথম মেয়াদে তার দৃঢ় শাসন ভারতে আদৃত হলেও দ্বিতীয় মেয়াদে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সমালোচিত হয়। তবে কার্জন ভারতীয় ব্রিটিশ প্রশাসনের সর্বস্তরে গতিশীলতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সমালোচনার মুখে তিনি পদত্যাগ করে ব্রিটেনে চলে যান। তবে এটা ঠিক যে, লর্ড কার্জন এদেশের শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

সীমান্ত নীতি (Frontier Policy)

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সুসংহত করার জন্য লর্ড কার্জন প্রথমেই সীমান্তবর্তী চিত্রল, খাইবার ও খুররম উপত্যকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করেন। এগুলো সরাসরি ব্রিটিশশাসিত অঞ্চল না হওয়ায় কার্জন চেয়েছিলেন, প্রয়োজন হলে এ অঞ্চলের উপজাতীয়রা ব্রিটিশ সাহায্য নিয়ে নিজেদের রক্ষা করবে। তার এ নীতির ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও শেষ পর্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি বিরাজমান ছিল। এ নীতির সম্পূরক হিসেবে তিনি পেশোয়ারকে রাজধানী করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সৃষ্টি করেন এবং এর শাসন পরিচালনার ভার দেন একজন চিফ কমিশনারের ওপর। সীমান্ত এলাকায় যাতে দ্রুত সামরিক সাহায্য প্রেরণ করা যায় সেজন্য তিনি রাজধানী থেকে দরবাই, জামরূদ ও লোথাল পর্যন্ত সামরিক রেলপথ নির্মাণ করেছিলেন।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

রাজনৈতিক সংস্কার (Political Reforms)

লর্ড কার্জনের অন্যতম বিতর্কিত পদক্ষেপ ছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভক্তি। সেই সময় ভারতবর্ষের প্রদেশগুলোর মধ্যে বাংলা প্রেসিডেন্সি ছিল আয়তনে খুবই বড়। এর যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল খুবই অনুন্নত। ফলে রাজধানী থেকে উপযুক্ত সহায়তা এখানে পৌছানো সহজ ছিল না। তাছাড়া এই বিশাল অঞ্চল একজন মাত্র গভর্নর জেনারেলের পক্ষে শাসন করা ছিল খুবই দূরুহ। এজন্য লর্ড কার্জন বাংলা প্রেসিডেন্সি দু'ভাগে ভাগ করেন- (ক) পশ্চিমবঙ্গ এবং (খ) পূর্ববঙ্গ ও আসাম। ঢাকাকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয়। কিন্তু ইতিহাসবিদরা মনে করেন, শুধুই প্রশাসনিক কারণে কার্জন বঙ্গ বিভাগ করেননি। এর পেছনে তার সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এটি ছিল ব্রিটিশদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির অংশ।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

প্রশাসনিক সংস্কার (Administrative Reforms)

লর্ড কার্জন প্রশাসনের দক্ষতা বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল 'অফিসিয়ালাইজেশন এবং সেন্ট্রালাইজেশন' (Officialization & Centralization)। এজন্য তিনি সমগ্র আমলাতন্ত্রকে ঢেলে সাজিয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গড়ে তোলার ওপর নজর দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সরকারের প্রতিটি বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করেন এবং এসব কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সংস্কারের সুবিধার জন্য তিনি এক এক করে প্রতিটি বিভাগের ত্রুটি চিহ্নিত করেন। কার্জন অফিস-হাজিরায় নিয়মিত বিলম্ব, ফাইলের শ্লথগতি, ফাইলে অহেতুক দীর্ঘ মন্তব্য, বাগাড়ম্বরপূর্ণ কার্যবিবরণী প্রভৃতি দূর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি সুশাসনের জন্য উদ্যোগী হতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিতেন। এভাবে সরকারি অফিসের ধীরগতিসম্পন্ন পদ্ধতিতে তিনি ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

লর্ড কার্জন অনেক সময় অন্যদের মতামত উপেক্ষা করে নিজের উপলব্ধির ভিত্তিতে কাজ করার উদ্যোগ নিতেন। সরকারের অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান পুলিশের ওপরও তিনি নজর দেন। এজন্য অ্যান্ড্রু ফেজারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। সে কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, পুলিশ সংস্থাটি একেবারে অদক্ষ, প্রশিক্ষণবিহীন ও সাংগঠনিকভাবে দুর্বল। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্পেষণমূলক। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কার্জন পুলিশ প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ও অপরাধ তদন্তের জন্য 'সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তোলেন। প্রথম দিকে এসব অফিসাররা কার্জনের কর্তৃত্বপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শীতল মনোভাব পোষণ করতেন, তবে শেষদিকে তারা নতিস্বীকার করেন

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

এবং ব্রিটিশ আমলারা তাদের প্রধানমন্ত্রীকে যেভাবে অনুসরণ করেন, ঠিক সেভাবেই লর্ড কার্জনকে অনুসরণ করতে শুরু করেন। ১৯০৩ সালের পুলিশ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কার্জন ভারতীয় পুলিশ বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। স্থানীয় সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে লর্ড রিপন যে উদার ও অংশগ্রহণমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন লর্ড কার্জন তার ঠিক উল্টো অবস্থান নেন। তিনি কলকাতা করপোরেশন আইন সংশোধন করে নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব হ্রাস করার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে তিনি এই করপোরেশনকে 'ইন্ডিয়ান হাউস' থেকে 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হাউসে' পরিণত করেন।

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

সামরিক সংস্কার (Military Reforms)

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে দুই ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হতো। প্রথমত, বিদেশি আগ্রাসন থেকে ভারতকে রক্ষা করা আর দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। লর্ড কার্জন সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে বেসামরিক প্রশাসনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ভাইসরয় হওয়ার পর সেনাবাহিনী সংস্কার কাজে হাত দেন। ভারতীয় বাহিনীকে তিনি দুটি কমান্ড: নর্দার্ন কমান্ড (Northern Command) এবং সাউদার্ন কমান্ডে (Southern Command) ভাগ করে সেনাবাহিনীর রেজিমেন্টগুলোকে শক্তিশালী করেন। তার সময়ে ইংল্যান্ডের ক্যাম্বারলি কলেজের আদলে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় ভারতীয় বাহিনীকে উন্নতমানের সমরাস্ত্রও সরবরাহ করা হয়।

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

অর্থনৈতিক সংস্কার (Economic Reforms)

কার্জনের প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে ছিল আর্থিক সংস্কার। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আর্থিক ভিত্তি মজবুত রাখতে না পারলে ভারতে কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখা মুশকিল হবে। এজন্য ভারতীয় মুদ্রা আইন পাস করে ভারতে ব্রিটিশ মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। কার্জনের সময় ভারতীয় মুদ্রার সাথে ব্রিটিশ পাউন্ডের বিনিময় হার ছিল পাউন্ড প্রতি ১৫ রুপি। এর মাধ্যমে তিনি ঋণভার কমাতে সক্ষম হন। কার্জনের আর্থিক সংস্কারগুলোর অন্যতম হচ্ছে লবণের ওপর কর হ্রাস করা। কার্জন জনগণের করভার লাঘবের জন্য আয়কর হ্রাস করেন। অতীতে যেখানে বাৎসরিক আয় ৫০০ রুপি হলেই আয়কর দিতে হতো, কার্জন সেখানে করমুক্ত আয়সীমা নির্ধারণ করেন ১০০০ রুপি। ব্যবসা-বাণিজ্য আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার জন্য কার্জন বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর নামে একটি নতুন দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। ডাক ও তার, কারখানা, রেলওয়ে প্রশাসন, খনি, বন্দর ইত্যাদি এ দপ্তরের অধীনে ছিল। এছাড়া লর্ড কার্জন দুর্ভিক্ষ, ভূমি রাজস্ব, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি, রেলপথ, কর ইত্যাদি বিষয়ে আইন পাস করেন। ১৮৯৯ সালে ভারতের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে খরা ও দুর্ভিক্ষ হলে তিনি দুর্ভিক্ষ কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা ও ত্রাণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

ভূমি সংস্কার (Land Reforms)

ভূমি ব্যবস্থায় লর্ড কার্জন প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, জমিদারদের অধীন কৃষকদের তুলনায় সরকারি খাস জমি চাষকারী কৃষকদের দেওয়া খাজনার পরিমাণ অনেক বেশি। এ কারণে তিনি খাস জমির খাজনার পরিমাণ হ্রাস করার জন্য নির্দেশ জারি করেন। ভূমি ব্যবস্থায় তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান 'পাঞ্জাব ল্যান্ড এলিয়েনেশন অ্যাক্ট'। এ আইনের লক্ষ্য ছিল ঋণের দায়ে কৃষককে জমি থেকে উৎখাত হওয়া থেকে রক্ষা করা ও অকৃষিজীবী মানুষের জমির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ ঠেকানো। লর্ড কার্জন মহাজনের শোষণ থেকে কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত এটিই ভূমি ব্যবস্থায় গৃহীত তার পদক্ষেপসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার (Reforms in Judiciary)

লর্ড কার্জন ভারতের বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠনেরও উদ্যোগ নেন। তার সময় কলকাতা হাইকোর্টে বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। কার্জন হাইকোর্ট ও অধীনস্থ কোর্টের বিচারকদের বেতন, পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেন। তার গৃহীত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে ভারতীয় দেওয়ানি আদালতের সংস্কার।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ (Archaeological Reforms)

লর্ড কার্জনের অসাধারণ একটি উদ্যোগ ছিল ভারতের প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, "কার্জনকে সবসময়ই স্মরণ করা হবে, কারণ ভারতের যা কিছু সুন্দর তা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।" প্রত্নসম্পদ রক্ষার জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ 'অ্যানশিয়েন্ট মনুমেন্ট প্রিজারভেশন অ্যাক্ট' পাস করে গড়ে তোলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর এবং পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ। তিনি এ দফতরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সরবরাহ নিশ্চিত করেছিলেন। একটা সময় ছিল যখন ভারতের প্রত্নসম্পদ ছিল কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়। কিন্তু কার্জনের এ উদ্যোগের ফলে বিদেশিদের পাশাপাশি ভারতীয়রাও এ উদ্যোগে যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

সাংস্কৃতিক সংস্কার (Culturul Reforms)

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কার্জন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি কলকাতায় নির্মাণ করেন অনিন্দ সুন্দর স্থাপত্য নিদর্শন 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'। ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং অক্সফোর্ডের বোদলেইয়ান লাইব্রেরির আদলে স্থাপন করেন 'ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি'। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য তিনি পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগের মাধ্যমে জেনারেল কানিংহামসহ অন্যদের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পথ সুগম হয়। কার্জন ঐতিহাসিক স্থাপনা থেকে সরকারি অফিস উচ্ছেদ করেন।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

শিক্ষা সংস্কার (Reforms in Education System)

লর্ড কার্জনের প্রশাসনিক অবদানের ইতিহাস সফলতায় ভরা। তবে তার দুটি উদ্যোগ জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর একটি হচ্ছে শিক্ষানীতি। ১৯০৪ সালের 'ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা হয়। এ কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য এ আইনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের সংস্কার করা। তখন পর্যন্ত শুধু পরীক্ষা গ্রহণ এবং অধিভুক্তকরণ ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান বিষয়ক কোনো কর্মকাণ্ড ছিল না। লর্ড কার্জনের সংস্কারের ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের সূচনা হয়। সাধারণ মানুষ এ সংস্কারকে স্বাগত জানায়। লর্ড কার্জন ঢাকায় যে টাউন হল স্থাপন করেন পরবর্তী সময়ে সেখানে ঢাকা কলেজের কার্যক্রম চালু হয়। অবশেষে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয় এখান থেকেই। শিক্ষা সংস্কার করতে গিয়ে কার্জন বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ক পড়াশোনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের সংস্কারমূলক কাজ

লর্ড কার্জন অনেক জনহিতকর সংস্কারের মাধ্যমে প্রথমদিকে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কার করতে গিয়ে তার জনপ্রিয়তায় ধস নামে। সেনাবাহিনীর সংস্কার প্রসঙ্গে লর্ড কিচেনার (Herbert Kitchener)-এর সঙ্গে তার গভীর মতপার্থক্য দেখা দেয়। কার্জন অনুভব করেন, ব্রিটিশ সরকারের 'ইন্ডিয়া অফিস' কিচেনারের পক্ষাবলম্বন করছে। এ পরিস্থিতিতে তিনি ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে পদত্যাগ করেন এবং সরকার তাৎক্ষণিকভাবে তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে। ১৯২৫ সালের ২০ মার্চ লর্ড কার্জনের মৃত্যু হয়। ইতিহাসবিদ পি ই রবার্টস তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, "ভালোমন্দ যাই হোক, লর্ড ডালহৌসির পর আর কোনো গভর্নর জেনারেল তার মতো সমগ্র ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় এতদূর প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি

লর্ড কার্জন

বঙ্গভঙ্গ

লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে সমগ্র বক্তাদেশ অর্থাৎ বাংলা প্রেসিডেন্সিকে দুটি প্রদেশে ভাগ করেন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত ছিল। এই বিশাল প্রদেশের শাসন ন্যস্ত ছিল একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর বা ছোটলাটের ওপর। রাজধানী কলকাতা থেকে নদীবহুল সুদূর পূর্ব বাংলার প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কিংবা সে অঞ্চলের জনসাধারণের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। পূর্ব বাংলা আর্থ-সামাজিকভাবে পশ্চিম বাংলার তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। এ কারণে প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলে লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে ভাগ করে পূর্বাঞ্চলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। এ নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অন্যদিকে বাংলার অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যার সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গ নামে অপর একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। তবে প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলা হলেও এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। বাংলাকে বিভক্ত করার পেছনে ব্রিটিশদের প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার কৌশল 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতিও কাজ করেছিল বলে ধারণা করা হয়।

লর্ড কার্জন

বঙ্গভঙ্গ

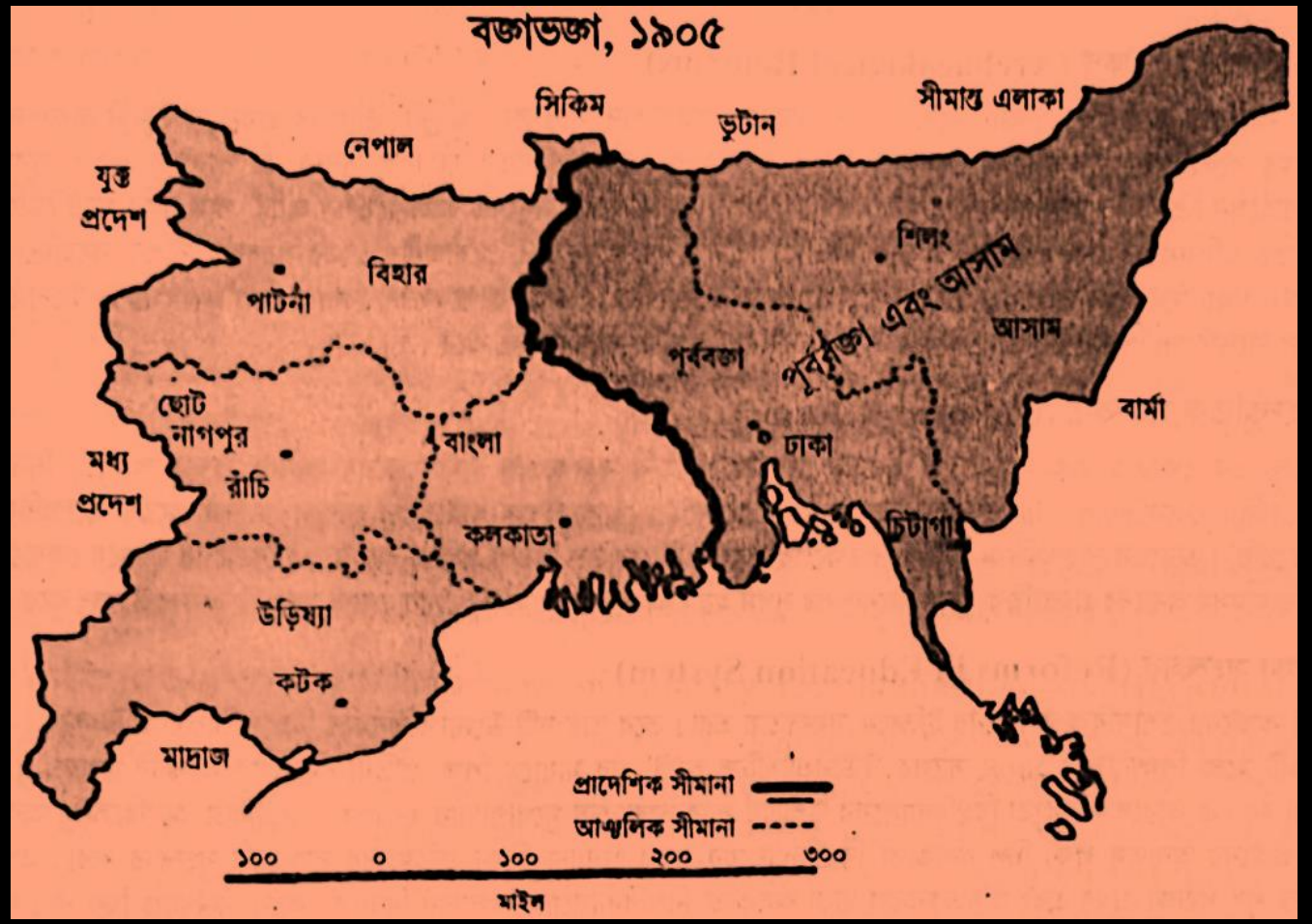

লর্ড কার্জন

বঙ্গভঙ্গ

বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপট: ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী তখন পর্যন্ত ছিল পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা। তাই সরকারের সব নজর ছিল মহানগর কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের ওপর। কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমবাংলার তুলনায় ভাটি অঞ্চলের নদনদীবহুল পূর্ব বাংলা শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষাসহ বিভিন্ন দিকে অনেক পিছিয়ে ছিল। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও কার্যকর পরিকল্পনার অভাবে বাংলার পূর্বাঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও এ অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য কোনো রকম কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ভূমিব্যবস্থার ত্রুটির সুযোগ নিয়ে অর্থলোভী হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা গ্রামবাংলার রায়তদের ওপর অত্যাচার চালাত। এমনকি রাজধানী কলকাতাতেই ২২টি কলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। অথচ তখন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের জন্য অনুরূপ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দুই অঞ্চলের মধ্যকার ব্যবধান লর্ড কার্জনের নজর. এড়ায়নি। তার ধারণা হয়, বঙ্গ বিভাগের ফলে প্রশাসনিক অব্যবস্থা দূর হওয়ার সাথে সাথে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের সুযোগ পাবে।

লর্ড কার্জন

বঙ্গভঙ্গ

হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া: মুসলমান নেতারা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেন। ঢাকাকে কেন্দ্র করে নতুন রাজধানী গড়ে ওঠায় মুসলমানরা এর মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখতে পান। ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন দেন। তাছাড়া ১৯১০ সালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মেমোরিয়াল কাউন্সিলে বিষয়টি পুনরুত্থাপনের চেষ্টা করলে বাংলার মুসলিম নেতা শামসুল হুদা এবং বিহারের মাযহারুল হক এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। মুসলিম পত্রপত্রিকাগুলো নতুন প্রদেশের সমর্থনে আনন্দ প্রকাশ করে। এদিকে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার সাথে সাথে হিন্দুদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। হিন্দুরা আগে থেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে আসছিল। তাই বঙ্গভঙ্গের পর তারা দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানায়। বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু নেতৃত্ব বুঝতে পারে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের নিপীড়িত কৃষক-শ্রমিক জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। আর মুসলমানরা শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটবে এবং রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হবে। ফলে বঙ্গভঙ্গকে হিন্দুরা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি।

লর্ড কার্জন

বঙ্গভঙ্গ

স্বদেশি আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ রদ: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গবিভক্তির (বঙ্গভঙ্গ) প্রবল বিরোধিতা করে। কংগ্রেস একে 'Divide and Rule' (ভাগ কর এবং শাসন কর) নীতি হিসেবে আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের ডাক দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' প্রভৃতি গান রচনা করেন। অনেক পরে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাখিবন্ধন' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের আহ্বান জানান। প্রথমদিকে অনেক প্রগতিশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দ বঙ্গবিভক্তি (বঙ্গভঙ্গ) বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তবে এ আন্দোলনে বিভিন্ন হিন্দুয়ানী অনুষ্ঠানাদি যুক্ত হলে ক্রমে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন এবং এ আন্দোলন হিন্দু সম্প্রদায়ের আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত হয়।

কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবর্গের অংশগ্রহণে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচি ছিল গুপ্ত হত্যা, দাঙ্গা, বিভিন্ন নাশকতামূলক কার্যাদি ইত্যাদি। আন্দোলনকারীরা এক পর্যায়ে ব্রিটিশ পণ্য ও শিক্ষা বর্জন করে। গড়ে ওঠে স্বদেশি স্কুল এবং কল-কারখানা। ইতিহাসে এটি স্বদেশি আন্দোলন নামে খ্যাত।

লর্ড কার্জন

বঙ্গভঙ্গ

এ আন্দোলন এক পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। বলা বাহুল্য, এ স্বদেশি ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু লর্ড কার্জন দমে গেলেন না। ভারতীয়দের মোকাবিলায় তিনি সিদ্ধহস্ত বলে লর্ড কার্জন গর্ববোধ করতেন। এমনকি তিনি একবার কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, তারা গঙ্গায় তো আর আগুন লাগাতে পারবে না। তবে লর্ড কার্জন শেষ পর্যন্ত বঙ্গবিভাগকে ঘিরে জ্বলে ওঠা স্বদেশি ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মুখে হতাশ ও বিচলিত হয়ে পদত্যাগের কথাও ভাবেন। ব্রিটিশ সরকারও এ আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এ আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে। এক পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গকে রদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ধারাবাহিকতায় ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ০৪ স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং আলীগড় আন্দোলন

টপিক ০৪: স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং আলীগড় আন্দোলন

This Topic is important for

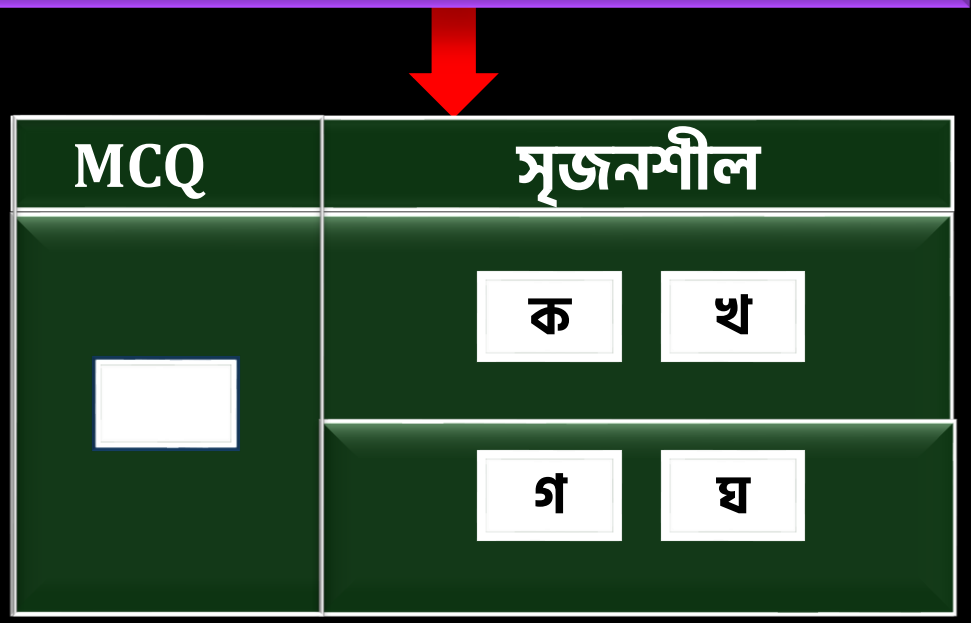

স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং আলীগড় আন্দোলন

স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) ছিলেন একজন স্বনামধন্য মুসলিম সমাজ সংস্কারক। তাকে আলীগড় আন্দোলনের জনক বলা হয়। তিনি ১৮১৭ সালে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজ সরকারের একজন কর্মচারী হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। ১৮৫৭ সালে তিনি বিজাপুরে সদর আমিনের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এ সময় তিনি ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত থেকে সিপাহি বিদ্রোহ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। এ জন্য ইংরেজ সরকার তাকে পুরস্কার প্রদান করে।

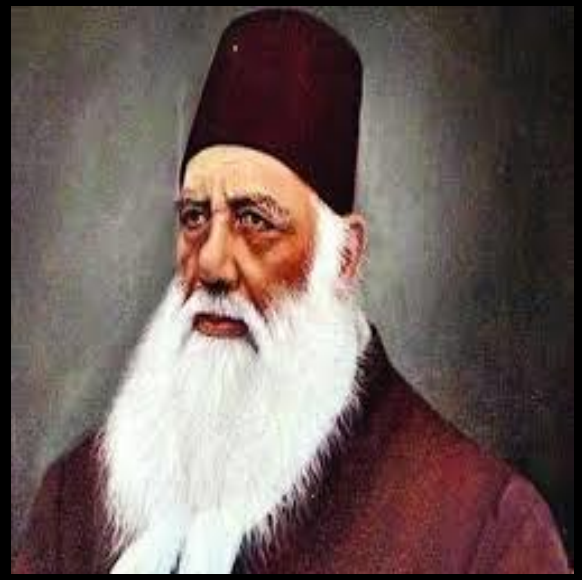

স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং আলীগড় আন্দোলন

আলীগড় আন্দোলন

সৈয়দ আহমদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঘৃণা তাদের শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত করেছে। মুসলমানদের ইংরেজবিদ্বেষী মনোভাব ইংরেজদের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। এ জন্য তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে ইংরেজ জাতির সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি মুসলমানদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিশীল ভাবধারা প্রসারের জন্য তিনি যে আন্দোলনের সূচনা করেন, তা-ই ইতিহাসে 'আলীগড় আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং আলীগড় আন্দোলন

আলীগড় আন্দোলন

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতীয় মুসলমানদের ওপর নেমে আসে ইংরেজ আধিপত্য। তাছাড়া এ'বিদ্রোহে ব্যর্থতার পর ভারতীয় মুসলমানরা হতাশায় নিমজ্জিত হয়। সিপাহিরা ক্ষমতাহীন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে তাদের নেতা ঘোষণা করেছিল। এ কারণে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের ওপর বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়। মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের এই নেতিবাচক মনোভাব দূর করার জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ 'সিপাহি বিদ্রোহের কারণ' এবং 'ভারতের রাজভক্ত মুসলমান' নামে দুটি পুস্তক রচনা করেন। এ পুস্তকদ্বয়ের মাধ্যমে স্যার সৈয়দ আহমদ ব্রিটিশদের এই বার্তাই দিতে চেয়েছিলেন যে, সিপাহি বিদ্রোহের জন্য মুসলমানরা দায়ী ছিলেন না; বরং তারা ইংরেজদের পক্ষেই ছিলেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিই এই বিদ্রোহের মূল কারণ বলে তিনি মনে করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম হান্টার (Sir William Wilson Hunter) The Indian Musalmans (১৮৭৬) গ্রন্থে সিপাহি বিপ্লবের পেছনে মুসলমানরা দায়ী ছিল বলে যে মন্তব্য করেন সৈয়দ আহমদ তা যুক্তি দ্বারা খণ্ডনের চেষ্টা করেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং আলীগড় আন্দোলন

আলীগড় আন্দোলন

স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ লক্ষ্যে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর ভারতের গাজীপুরে একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজিতে রচিত মূল্যবান বইগুলো উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে তিনি 'বিজ্ঞান সমিতি' নামে একটা সংস্থা গঠন করেন। পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শ ও শিক্ষাব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য সৈয়দ আহমদ খান নিজে বিলাত ভ্রমণ করেন। ১৮৭০ সালে দেশে ফিরে এসে 'তাহজিবুল আখলাক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের কুসংস্কার দূর করতে সচেষ্ট হন। একই সময়ে তিনি বেনারসে 'ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়ন
সমিতি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ১৮৭৫ সালে আলীগড়ে মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ সালে উক্ত স্কুলটি কলেজে উন্নীত হলে আলীগড় মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এখানে মুসলমান ছাত্ররা শুধু আধুনিক কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষাই গ্রহণ করেনি, বরং তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং আলীগড় আন্দোলন

আলীগড় আন্দোলন

আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক ভাবধারার চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয় এবং পরবর্তীকালে এই কলেজ তাদের রাজনৈতিক জীবনকেও প্রভাবিত করে। ১৮৮৬ সালে সৈয়দ আহমদ খান 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নামে অন্য একটি সংস্থা গঠন করেন। প্রতিবছর তার উৎসাহে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমান নেতারা এক জায়গায় মিলিত হতেন এবং মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকারের উপায় নিয়ে আলোচনা করতেন। এভাবে সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম সমাজে এক নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক। এ জন্য তিনি কুরআনের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু তার যুক্তিবাদী চিন্তা ও আধুনিক মূল্যবোধ গোঁড়াপন্থি মুসলমানগণ সুনজরে দেখেননি। এ জন্য তিনি বাধার সম্মুখীন হন।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং আলীগড় আন্দোলন

শিক্ষাক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অবদান

প্রথম দিকে সৈয়দ আহমদ খান দেশের অগ্রগতির স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের কথা বলেন। কিন্তু ১৮৬৭সালে বেনারসে হিন্দি-উর্দু বিতর্ক তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। এ সময়ে উত্তর প্রদেশে নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা কোর্ট কাচারিতে উর্দুর পরিবর্তে নাগরি বর্ণমালায় লিখিত হিন্দি ভাষা প্রচলনের জন্য আন্দোলন শুরু করলে তিনি ক্ষুব্ধ হন। উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের ভাষা ছিল মূলত উর্দু। এমন প্রেক্ষাপটে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তিনি মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাতদের নিয়ে তার উদ্যোগে ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন'। ভারতীয় জনগণের মন থেকে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব দূর করা, দেশে শান্তি রক্ষা ও সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা ছিল এ সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ সময় উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে গো হত্যা নিবারণ সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং সহিংসতা সৃষ্টি হলে মুসলমানদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সৈয়দ আহমদ খান আলীগড়ে 'মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন' গঠন করেন। ১৮৯৮ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খান মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ভারতীয় মুসলিম জনসমাজকে অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছিলেন। তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ০৫ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

টপিক ০৫: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

This Topic is important for

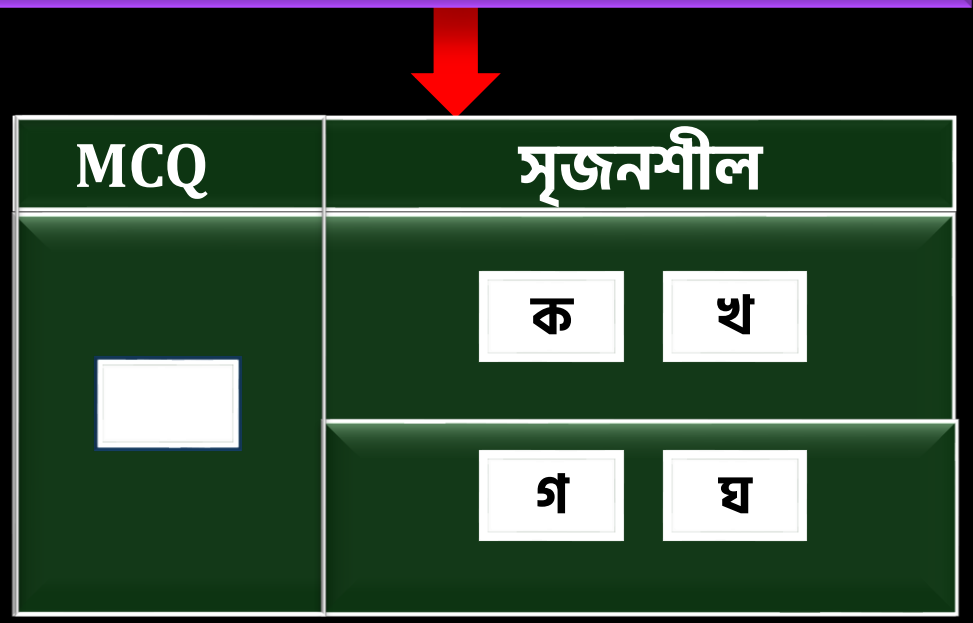

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এটি ভারতীয়দের সংযম ও সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ নীতি ও শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠলে ১৮৫৭ সালের পূর্বে ও পরে কয়েকটি ছোট ছোট রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' এবং ১৮৫১ সালে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। কিন্তু এসব সমিতি শিক্ষিত অভিজাত ও জমিদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকায় মধ্যবিত্ত বা সাধারণ জনগণের মধ্যে এগুলোর কোনো আবেদন ছিল না। শাসন সংস্কারের মাধ্যমে দেশ শাসনে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি ও তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায় করাই ছিল এসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ১৮৭৬ সালে বাঙালি নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কলকাতায় 'Indian Association' বা 'ভারত সভা' নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক সম্ভাব বজায় রাখা এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ছিল এর লক্ষ্য। উল্লেখ্য, এ সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত কলকাতায় হিন্দু মহাবিত্ত শ্রেণি চাকরিসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে। জারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই মহাবিত্ত শ্রেণির কাকে ধারণ করার চেষ্টা করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৮৭৬ সালে ভারতের বড়লাট লিটন (Robert Bulwer-Lytton) দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করার জন্য Vernacular Press Act Arms Act পাস করেন। ভারত সভা' (Indian Association) এ দুটো আইনের তীব্র বিরোধিতা করে। বিতর্কিত আইন দুটির জেরে ইংরেজ শাসক ও ভারতীয়দেরসম্পর্কের ক্ষেত্রে চরম অবনতি ঘটে। ধীরে ধীরে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এমন গ্রেফাপটে ইংরেজ সরকার ইলবার্ট বিল উত্থাপন করে। ইংরেজরা এ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললে ভারত সভা' সংগঠনটি ইলবার্ট বিলের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলে।

ইউরোপীয়দের ইলবার্ট বিল বিরোধী বিক্ষোভ ভারতীয় অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। ফলে তারা তাদের দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করে। ১৮৮৩ সালে বাঙালি নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং আনন্দমোহন বসুর আহ্বানে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিরা কলকাতায় ইলবার্ট হলে মিলিত হয়ে তাদের এই মনোভাব প্রকাশ করে। এদিকে ভারতের ব্রিটিশ সরকারও তাদের সমাজের এই উদ্যোগে শঙ্কাবোধ করে। এ সময়ে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume- সাবেক ইংরেজ প্রশাসক) ভারতবাসীর অসন্তোষ প্রশমিত করার লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন । তিনি ১৮৮৩ সালের ১ মার্চ একটি খোলা চিঠির মাধ্যমে ভারতীয়দের রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষ লাভের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। মূলত অ্যালান হিউমের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে একটি নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি

অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের (Lord Dufferin) সাথে সাক্ষাৎ করে তার সহযোগিতায় ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বে শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) গঠন করেন। ২ জন মুসলিম সদস্যসহ ৭০ জন প্রতিনিধি এই প্রথম অধিবেশনে মিলিত হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য: বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। এ অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৪টি উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে। এগুলো হলো:

১. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশসেবকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা;
২. জাতি-ধর্ম ও আঞ্চলিকতার সংকীর্ণতা দূর করে জাতীয় ঐক্যের পথ সুগম করা;
৩. শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ বের করা এবং
৪. রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য পরবর্তী বছরের কর্মসূচি নির্ধারণ করা।

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রথম জাতীয়ভিত্তিক সংগঠন। প্রথম দিকে অল্প কয়েকজন মুসলমান এতে যোগদান করেন। কিন্তু এর কর্মসূচি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থি হওয়ায় পরবর্তী সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খানসহ অনেক মুসলিম নেতা একে বর্জন করেন এবং মুসলমানদের এতে যোগদানে নিষেধ করেন। সে সময় ভারতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হতো। কিন্তু ক্রমেই এটি সংগ্রামের মাধ্যমে দাবি আদায়ের নীতি গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে এটি সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বিরোধী দলে পরিণত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ০৬ মুসলিম লীগ

টপিক ০৬: মুসলিম লীগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুসলিম লীগ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান দলমত নির্বিশেষে সকল ভারতীয় জনগণের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এটি হিন্দুদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে। ফলে মুসলমানগণ নিজেদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ জন্য ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলমানদের স্বার্থ ও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গড়ে ওঠে।

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

উনিশ শতকে স্যার সৈয়দ আহমদ খানসহ বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ফল হিসেবে একদিকে যেমন মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়, তেমনি কংগ্রেসের রাজনীতি হতে দূরে থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থেও এগিয়ে আসে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এ রূপ স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক ধারারই ফল।

১৯০৫ সালে নবগঠিত পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ অধিকতর সুযোগ-সুবিধার আশায় নতুন প্রদেশ গঠনের সরকারি পদক্ষেপকে সমর্থন জানায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় ও কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গবিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলন এ অঞ্চলের মুসলমান নেতৃবৃন্দকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। এর ফলে নবাব সলিমুল্লাহ এবং নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী জাতীয় কংগ্রেসের বিপরীতে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন অনুভব করেন।

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

পরবর্তী বছরের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় ভারত সচিব লর্ড মর্লে ভারতের জন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্যোগের কথা ব্যক্ত করলে মহসিন-উল-মুল্কের উদ্যোগে ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের অনুভূতি ব্যক্ত করার গুরুত্ব অনুভব করে। মুসলমানগণ ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর ৩৫ সদস্যের মুসলিম প্রতিনিধি দল আগা খানের নেতৃত্বে সিমলায় ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে মতবিনিময় করেন। ইতিহাসে এটি 'সিমলা ডেপুটেশন' নামে খ্যাত। সমবেত নেতৃবৃন্দ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সিমলায় পরস্পর মতবিনিময় করেন। এরপর তারা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেন্সি' নামে একটি দলের প্রস্তাব দেন। ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয় 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'এর বার্ষিক সম্মেলন। সম্মেলনের শেষ দিনে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম প্রতিনিধিগণ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। নবগঠিত দলের যুগ্ম আহবায়ক নির্বাচিত হন নবাব মহসীন-উল-মুলক ও ভিকার-উল-মুলক।

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

প্রাথমিকভাবে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

ক. ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহযোগিতা ও আনুগত্যের মনোভাব বজায় রাখা।

খ. মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সরকারের কাছে তুলে ধরা।

গ. উপর্যুক্ত লক্ষ্যের কোনো ক্ষতি না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্ভাব গড়ে তোলা।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ভারতের মুসলমান সমাজে এক নতুন আশার সঞ্চার করে। বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যারা কংগ্রেসের চাপে নিজেদের মেলে ধরতে পারছিল না তারা নতুন আশায় বুক বাঁধে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ০৭ লক্ষ্ণৌ চুক্তি

টপিক ০৭: লক্ষ্ণৌ চুক্তি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

বঙ্গভঙ্গকে ঘিরে ভারতে হিন্দু-মুসলিম অপ্রীতিকর সম্পর্ক তৈরি হলে ভারত সরকার শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস নেয়। কিন্তু ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন কোনো পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এ আইনে যদিও প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি স্বীকার করে নেয়া হয় এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার প্রদান করা হয় তথাপি এতে মুসলিম সম্প্রদায় পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এ সময় কয়েকটি ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা তাদেরকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সন্দিহান করে তোলে। এটি ভারতের মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং এতে রাজনীতিতে গভীর প্রভাব পড়ে। এ সময়েই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯১৩ সালের মার্চে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে দলের নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। এতে বলা হয় যে, জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং স্বরাজ অর্জনই হচ্ছে লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এর ফলে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

এরপর মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস প্রায় একই সময়ে ও স্থানে এদের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করে। এক দলের প্রতিনিধিগণ আরেক দলের অধিবেশনে যোগদান করে। ১৯১৫ সালের বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত উভয় দলের সম্মেলনেই সরকারি নীতির সমালোচনা করা হয় এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ওপর জোর দেয়া হয়।

১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এদের বার্ষিক সম্মেলন লক্ষ্ণৌ শহরে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময়ে উভয় সম্প্রদায় ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের নীতির প্রশ্নে একটা সমঝোতায় আসে। এটাই ইতিহাসে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে পরিচিত। এ চুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলিতভাবে দাবি পেশ করে।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

লক্ষ্ণৌ চুক্তির বৈশিষ্ট্য

১. লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য সংখ্যা ১৫০ জন করার সুপারিশ করা হয়। এদের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগ হবেন নির্বাচিত সদস্য এবং বাকি একভাগ মনোনীত সদস্য। যতদূর সম্ভব ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। নির্বাচিত সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুসলিম সদস্য এবং নিজ সম্প্রদায়ের দ্বারাই তারা নির্বাচিত হবেন।

২. কেন্দ্রের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, শুল্ক, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ। ভারত সচিবের কাউন্সিল বিলুপ্ত করতে হবে এবং ব্রিটিশ সরকারই তাকে বেতন দেবে। তার সাহায্যকারী থাকবেন দু'জন এবং এদের মধ্যে একজন হবেন ভারতীয়।

৩. প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষেত্রে দাবি করা হয় যে, বৃহৎ প্রদেশে সদস্য সংখ্যা ১২৫ জনের কম হবে না। ছোট প্রদেশগুলোতে এ সংখ্যা হবে ৫০ থেকে ৭৫ এর মধ্যে। প্রদেশের ক্ষেত্রেও চার-পঞ্চমাংশ সদস্য হবেন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ মনোনীত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

লক্ষ্ণৌ চুক্তির বৈশিষ্ট্য

৪. প্রদেশগুলোতে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার ক্ষেত্রে মুসলিম সদস্য থাকবে পাঞ্জাবে ৩৩%, যুক্তপ্রদেশে ৩০%, মধ্যপ্রদেশে ১৫%, বাংলায় ৪০%, বিহারে ২৫%, মাদ্রাজে ১৫% ও বোম্বেতে ৩৩%। এখানেও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমেই মুসলিম প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবে। তবে শর্ত ছিল যে, এ সব সংরক্ষিত আসন ছাড়া মুসলমানরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক অন্য কোনো আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

৫. লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইন পরিষদে কোনো সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিল কখনো গৃহীত হবে না যদি উক্ত সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সে বিলের বিরোধিতা করে।

৬. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একত্রে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৭. চুক্তিতে দাবি করা হয় যে, ডোমিনিয়ন সরকারসমূহের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের উপনিবেশ মন্ত্রীর যে সম্পর্ক, ভারত সরকারের সাথে ভারত সচিবের সম্পর্কও হতে হবে অনুরূপ।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

লক্ষ্ণৌ চুক্তির বৈশিষ্ট্য

উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বকালের ইতিহাসে লক্ষ্ণৌ চুক্তিই হচ্ছে প্রথম হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সমঝোতার স্বাক্ষর। ভারতের জন্য একটি সংবিধানের মূল রূপরেখা প্রণয়নে এটা ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ প্রয়াস। এ চুক্তি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি রচনা করে। এর দ্বারা উভয় সম্প্রদায় সরকারের নিকট যুক্তভাবে নিজেদের দাবিনামা পেশ করার সুযোগ পায়।

লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে কংগ্রেস প্রথমবারের মতো মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার স্বীকার করে। মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বলেও মেনে নেয়। তবে এ চুক্তির কিছু সমালোচনা রয়েছে। বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। শুধু হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার খাতিরে তাদেরকে দুই প্রদেশে জনসংখ্যা অনুপাতে কম সংখ্যক নির্দিষ্ট আসন মেনে নিতে হয়েছে। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী এ চুক্তির প্রতিবাদে বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ান। অন্যদিকে এ চুক্তির ফলে পাঞ্জাবে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে। মাদ্রাজে তামিলভাষী মুসলমানরা চুক্তির বিরোধিতা করে। তথাপি এটা অনস্বীকার্য যে, ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন: ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদনের পরে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস যৌথভাবে ভারতবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দাবি করলে ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট ব্রিটেনের কমন্সসভায় তদানীন্তন ভারত সচিব মি. মন্টেগু ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসনকে কেন্দ্র করে নিম্নোক্ত বক্তব্য তুলে ধরেন- "মহামান্য সরকারের নীতির সাথে ভারত সরকারের পূর্ণ সম্মতি রয়েছে, যার লক্ষ্য হলো শাসন বিভাগের প্রত্যেক শাখায় ভারতীয়দের সহযোগিতা বৃদ্ধি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমোন্নতি সাধন করা যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারত দায়িত্বশীল সরকার হাসিল করতে সক্ষম হয়।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসীরা তাদের যথাশক্তি নিয়োগ করে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বপ্রকার সাহায্য করলে ভারতবাসীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিমিত্তে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সচিব মন্টেগুকে সরেজমিনে সবকিছু তদন্ত করে ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশানুসারে ভারত সচিব মন্টেগু ১৯১৭ সালের শেষ পর্যায়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং তৎকালীন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সাথে এ দেশবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দাবি প্রসঙ্গসহ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এর ভিত্তিতে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি আইন পাস করে। এটা ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত। মন্টেগু-চেমসফোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত আইন পাস হয়েছিল বলে একে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনও বলা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ০৮ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

টপিক ০৮: খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৮ সালের পর ইংরেজ প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের ফলে আবহমান হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনেক অবনতি ঘটে। এই আন্দোলনদ্বয় ভারতের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে বের করে এনে আবার ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন করার সুযোগ করে দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত আন্দোলন সফল হয়নি। ফলে ব্রিটিশ শক্তি আরও কিছুদিন ভারত শাসন করার সুযোগ লাভ করে। এ দুটি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

তুরস্কের খলিফাকে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে মনে করা হতো। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটেনের নেতৃত্বে গঠিত মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এবং জার্মানির পক্ষে অবতীর্ণ হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানদের মনে দ্বৈত আনুগত্যের প্রশ্ন দেখা যায়। মহাযুদ্ধের সময় ভারতের মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারকে এ শর্তে সমর্থন দেয় যে, ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে ব্রিটিশরা সে প্রতিশ্রুতি মেনে চলেনি। সেজন্য তুরস্কের খলিফার মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে ভারতীয় মুসলমানগণ এক আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন ইতিহাসে 'খিলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত। মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯২০ সালে মিত্রপক্ষ তুরস্কের ওপর 'সেভার্সের চুক্তি' চাপিয়ে দিয়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে খন্ড বিখন্ড করার উদ্যোগ নিলে খিলাফত আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

১৯১৯ সালের অক্টোবরে লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় মুসলমানদের একটি বৈঠকে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। বোম্বেকে কেন্দ্র করে সব প্রদেশে কমিটির শাখা-প্রশাখা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। পরের মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে দিল্লিতে খিলাফত কমিটির প্রথম সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার মর্যাদা রক্ষার কোনো প্রতিশ্রুতি না দিলে মুসলমানরা সরকারের সঙ্গে অসহযোগ নীতি অনুসরণ করবে। প্রয়োজনে তারা ব্রিটিশ পণ্যও বর্জন করবে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী খিলাফতের বিষয়ে কংগ্রেসের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ১৯২০ সালের প্রথম দিকে মওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন খিলাফতের ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য প্যারিস ও লন্ডন সফর করেন। কিন্তু ব্রিটেন অথবা মিত্রপক্ষের কেউই এ ডেপুটেশনকে কোনো বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। ফলে প্রতিনিধিরা ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে আসলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন আরও তীব্র এবং জোরদার হয়।

মওলানা মোহাম্মদ আলী

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ সালের ১৯ মার্চ সারা ভারতে খিলাফতের দাবিতে হরতাল পালিত হয়। মে মাসে বোম্বেতে খিলাফত কমিটির সভায় ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। জুন মাসে এলাহাবাদে খিলাফত কমিটির আহ্বানে হিন্দু ও মুসলিম নেতাদের এক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি চূড়ান্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

মওলানা মোহাম্মদ আলী

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

এদিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আরেকটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার চরমপন্থি বিপ্লবী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে নিবর্তনমূলক রাওলাট আইন পাস করে এবং বিনাবিচারে শত শত লোককে কারাবন্দি করে। উক্ত আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও প্রতিবাদ আন্দোলনের পটভূমিতে সংঘটিত হয় ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কর্নেল ডায়ার (Reginald Dyer) নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালিয়ে কয়েকশ লোককে হত্যা করে। এতে ইংরেজবিরোধী মনোভাব চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের সহযোগিতা লাভের জন্য ইতোপূর্বে সৃষ্ট খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করেন।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

উল্লেখ্য যে, ১৯২০ সালের ১০ আগস্ট সেভার্স চুক্তির পর এর প্রতিবাদে মুসলমানগণ ৩১ আগস্ট খিলাফত দিবস পালন করে। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের এবং পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা দেয়া হয়। জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগের কর্মসূচি হিসেবে সরকারি চাকরি ও পদবি ত্যাগ, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ আদালত ও আইন ব্যবসা বর্জন, বিলাতি দ্রব্য পরিহার ইত্যাদি প্রস্তাব গ্রহণ করে। একই সময়ে নাগপুরে খিলাফত কমিটি ও মুসলিম লীগ অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচি অনুমোদন করে এবং উভয় সংগঠন স্বাধীনতাকে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। ফলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানের যৌথ আন্দোলনে পরিণত হয়।

মহাত্মা গান্ধী

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

১৯২১ সালের শুরুতে উভয় আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। ছাত্র-শ্রমিক-চাকুরিজীবী-আইনজীবী সকলেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলনের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠন গড়া রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। এ আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করে। অনেকে আবার স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে। মুসলমানরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ত্যাগের হুমকি দেয়।

মহাত্মা গান্ধী

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

১৯২১ সালের আহমেদাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং সর্বত্র অচলাবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারকে কর ও খাজনা প্রদান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে অহিংসার স্থলে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে মালাবারে মুসলমান কৃষকেরা জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশ্রয় নেয়। এরপর ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে উত্তর প্রদেশের চৌরিচোরা নামক স্থানে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা থানা আক্রমণ করে ২১ জন সিপাহি ও একজন দারোগাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।

গান্ধী তার অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনকে এভাবে সহিংসতায় পরিণত হতে দেখে শঙ্কিত হন। ১৯২২ সালে তিনি সমগ্র আন্দোলনের সকল কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। এতে সারাদেশে হতাশার সৃষ্টি হয়। সরকার গান্ধীকে গ্রেফতার করে। অসহযোগ আন্দোলনের অবসানে খিলাফত আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯২৪ সালের তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক খিলাফত বিলুপ্ত ঘোষণার পর এ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সফল না হলেও সে গণজাগরণ ছিল অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয়। উপমহাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে আন্দোলন দুটির অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ০৯ সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট

টপিক ০৯: সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট

সাইমন কমিশন: ১৯১৯ সালে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড' সংস্কার আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। ফলে এ বিষয়ে পুনরায় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভাইসরয় লর্ড আরউইন ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ উদারনৈতিক দলের সদস্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি পার্লামেন্টারি কমিশন নিয়োগ করেন। কিন্তু সাইমন কমিশনে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব না থাকায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একে মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ কমিশনকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেদিন উক্ত কমিশনের সদস্যরা ভারতে পদার্পণ করেন সেদিন হরতাল আহ্বান করা হয় এবং 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনি উত্থিত হয়। এর মধ্যে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি বিধানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সচেষ্ট হন। মুসলিম লীগ একটি সাব কমিটি গঠন করে এবং কংগ্রেসের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্যোগ সমর্থন করে। পরে সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য কংগ্রেস একটি সর্বদলীয় সভা ডাকে।

স্যার জন সাইমন

সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট

নেহরু রিপোর্ট

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে নেহরু রিপোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন যে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলিম ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল তা অচিরেই হিন্দু-মুসলিম তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। এ পরিস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু তা সফল হয়নি। এদিকে সাইমন কমিশনের (১৯২৭) প্রস্তাবগুলোও ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, কেননা ভারতের ডোমিনিয়ন মর্যাদা লাভ করাই ছিল ভারতীয়দের অন্যতম দাবি। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে একটি সংবিধান রচনার জন্য কংগ্রেস নেতা নেহরু একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। তার নামানুসারে একে নেহরু রিপোর্ট বলা হয়। উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক বিকাশের ইতিহাসে নেহরু রিপোর্ট এক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট

নেহরু রিপোর্ট

ইতোমধ্যে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতীয়দের সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে এলাহাবাদে সর্বদলীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বিরোধের কারণে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয়নি।

সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট

নেহরু রিপোর্টের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৯২৮ সালের নেহরু রিপোর্টে ভারতের জন্য পূর্ণ ডোমিনিয়নের মর্যাদা দাবি করা হয়। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট একটি আইনসভা গঠনের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত আইনসভার ক্ষমতা হবে সর্বোচ্চ এবং শাসন বিভাগের ওপর আইনসভার পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রদেশগুলোর ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয় এবং কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দেয়া হয়। প্রদেশগুলোতে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার কথা বলা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নিম্নকক্ষ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলো জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হবে। আগেকার সমস্ত আইনে স্বতন্ত্র নির্বাচনের যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল এ প্রস্তাবে তা প্রত্যাহার করে যৌথ নির্বাচন নীতি গ্রহণ করা হয়। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের কোনো ব্যবস্থা রাখা না হলেও কেন্দ্র ও অমুসলমান প্রধান প্রদেশগুলোতে লোকসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা ছিল না। আপাতত দশ বছরের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে আসন সংরক্ষণ প্রথা চালু থাকবে।

সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট

নেহরু রিপোর্টের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ডোমিনিয়ন মর্যাদা দানের পর সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে আলাদা প্রদেশরূপে স্বীকৃতি দিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মর্যাদা প্রদান করা হবে। তবে সেখানে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত থাকবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তার কথা বলা হয়। নেহরু রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো পৃথকভাবে এ রিপোর্টের বিচার বিবেচনা করে।

সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট

নেহরু রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটি নেহরু রিপোর্টের প্রস্তাবগুলোর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। তবে জওহরলাল নেহরু এ রিপোর্টে পূর্ণ স্বরাজের বদলে ডোমিনিয়ন মর্যাদা মেনে নেয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কংগ্রেস সচিবের পদ থেকে ইস্তফা দেন। কিছু শিখ নেতা রিপোর্টে প্রস্তাবিত সাম্প্রদায়িক ধারাগুলো গ্রহণে অসম্মত হন। সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের বিশেষ অধিকারগুলো স্বীকৃত না হওয়ায় হরিজনেরা অসন্তুষ্ট হয়। নেহরু রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা এবং বিভিন্ন দলের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় যে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে মুসলিম লীগের পক্ষে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নেহরু রিপোর্ট সংশোধনের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব আনেন।

সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট

নেহরু রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া

এগুলো ছিল:

১. কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ আসন;

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ;

৩. প্রদেশগুলোর জন্য রেসিডুয়ারি বা অন্যান্য ক্ষমতা;

৪. বোম্বে থেকে সিন্ধুর পৃথকীকরণ।

কিন্তু হিন্দু মহাসভা এ সব দাবি মানতে কোনোভাবেই রাজি ছিল না। কংগ্রেসও জিন্নাহর প্রস্তাবগুলোর বিরোধিতা করে। কোনো সমঝোতা না হওয়ায় মুসলিম লীগ নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। লীগ নেতৃবৃন্দ এ রিপোর্টকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থি বিবেচনা করে একে প্রত্যাখ্যান করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ১০ জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

টপিক ১০: জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

This Topic is important for

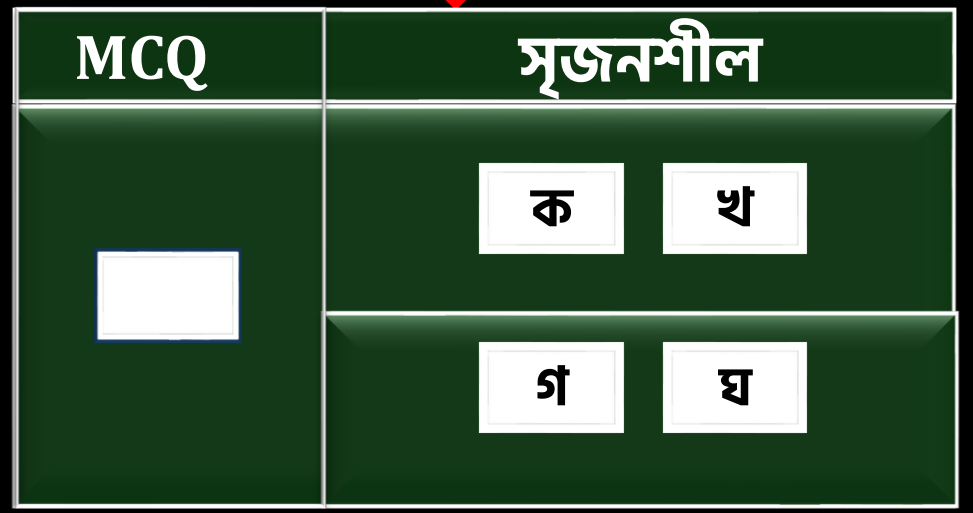

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

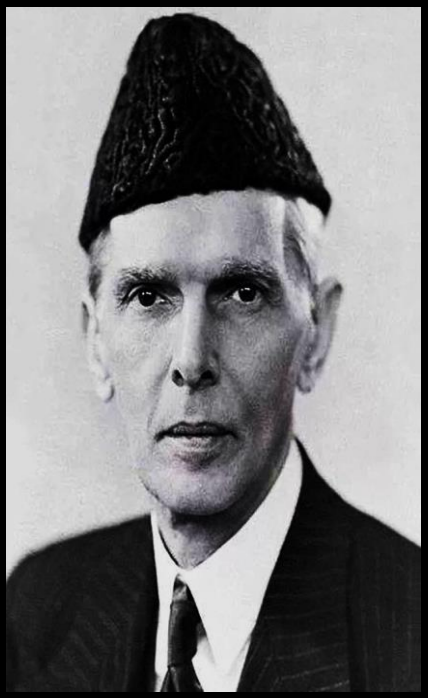

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর চৌদ্দ দফা দাবি একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের সংশোধনী কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে এর প্রতিবাদে জিন্নাহ বিকল্প হিসেবে ১৯২৯ সালে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এই ১৪ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার যে সকল প্রয়াস সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত হয় চৌদ্দ দফা দাবি সে ক্ষেত্রে ছিল আরেকটি সংযোজন। কেন্দ্রীয় আইন, পরিষদে মুসলমানদের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ আসন সংরক্ষণ, রেসিডুয়ারি বা অন্যান্য ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেয়া ইত্যাদি ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হিন্দু মহাসভাসহ অন্যরা জিন্নাহর প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় জিন্নাহ একে হিন্দু-মুসলমানের পথের বিভক্তি বলে আখ্যায়িত করেন।

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

১. ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের গঠন হবে ফেডারেল পদ্ধতির। রেসিডুয়ারি বা অন্যান্য ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে।

২. সব প্রদেশকে একই ধরনের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

৩. প্রদেশসমূহের আইন পরিষদে ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। তবে সে প্রতিনিধিত্বের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠরা যাতে সংখ্যালঘুতে পরিণত না হয় সে দিকে নজর দিতে হবে।

৪. কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না।

৫. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে কোনো সম্প্রদায় ইচ্ছা করলে পৃথক নির্বাচনের বদলে যে কোনো সময় যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে।

৬. ভূখণ্ডগত কোনো পুনর্গঠন দ্বারা পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম সংখ্যারিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ করা যাবে না।

৭. সকল সম্প্রদায়কে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শিক্ষার অধিকার দিতে হবে।

৮. কোনো সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ছাড়া কোনো আইন পরিষদ বা নির্বাচিত সংস্থায় উক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো আইন বা প্রস্তাব অথবা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

৯. সিন্ধুকে বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক করতে হবে।

১০. ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসন সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

১১. সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকরিতে যোগ্যতা অনুসারে অন্যান্য ভারতীয়দের ন্যায় পর্যাপ্ত হারে মুসলমানদের নিয়োগ করতে হবে।

১২. মুসলমানদের সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে।

১৩. কমপক্ষে সংখ্যানুপাতিক এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান মন্ত্রী ছাড়া কেন্দ্র বা কোনো প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করা যাবে না।

১৪. ভারত ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত সব রাজ্যের সম্মতি ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন আনা যাবে না।

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

চৌদ্দ দফার গুরুত্ব

জিন্নাহর চৌদ্দ দফার গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের যে শর্তাদি প্রদত্ত হয়েছিল তার প্রতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও তাদের মিত্রদের অশ্রদ্ধা ও অনীহা ভারতের মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে তাদের জন্য একটি উপযুক্ত সংবিধানের দাবি তোলা হয়। তাছাড়া পরবর্তীকালে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ মূলত জিন্নাহর চৌদ্দ দফার ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছিল। কাজেই চৌদ্দ দফা দাবির গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ১১ গোলটেবিল বৈঠক

টপিক ১১: গোলটেবিল বৈঠক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

গোলটেবিল বৈঠক

১৯৩০ সালের কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতে 'আইন অমান্য আন্দোলন' চলছিল। সে বছরের মে মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল এ রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। এ বৈঠক তিনটি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়।

গোলটেবিল বৈঠক

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক

গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৩০ সালের ১২ নভেম্বর। অধিবেশনে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে ১৬, ভারতীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে ১৩ এবং ব্রিটিশশাসিত ভারত থেকে ৫৭ জনসহ সর্বমোট ৮৯ জন সদস্য যোগ দেন। কংগ্রেস এ অধিবেশনে যোগ দেয়নি। উপস্থিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ড. ভিমরাও রামজী আম্বেদকার, মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং তেজ বাহাদুর সাপ্রু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড এ বৈঠকে কতগুলো সাংবিধানিক প্রস্তাব দেন; তার মধ্যে ১. ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন, ২. প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার এবং ৩. কেন্দ্রে আংশিক দায়িত্বশীল সরকার গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো অন্যতম।

ভারতের রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরা মোটামুটিভাবে প্রস্তাবগুলো মেনে নেন। কিন্তু মুসলিম প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমান সম্প্রদায়ের ন্যূনতম দাবি হিসেবে তার চৌদ্দ দফা দাবির পুনরুল্লেখ করেন। তফসিলি সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ডক্টর আম্বেদকারও পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। হিন্দু প্রতিনিধিরা যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন, যদিও তাঁরা সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ নীতি সমর্থন করেন। যা হোক, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে মতদ্বৈততার কারণেও কংগ্রেস এ বৈঠক বর্জন করায় গোলটেবিল বৈঠক মুলতুবি হয়ে যায়।

গোলটেবিল বৈঠক

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর ১৯৩১ সালে লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কংগ্রেসের একক প্রতিনিধিরূপে মহাত্মা গান্ধী এ বৈঠকে যোগদান করেন। ফেডারেল ব্যবস্থা ও সংখ্যালঘু প্রশ্ন-এ দুটি ছিল বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। শুরুতে গান্ধী কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্বের একমাত্র দাবিদার বললে উপস্থিত অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে এর কড়া প্রতিবাদ জানান। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের ব্যাপারে এর পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকে। কিন্তু গান্ধী এতে রাজি ছিলেন না। তিনি বরং অবিলম্বে কেন্দ্রে ও প্রদেশে একই সঙ্গে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতারও তিনি বিরোধিতা করেন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে গান্ধীর প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। প্রধানত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যেই মুসলমান, শিখ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণের দাবি জানায়

গোলটেবিল বৈঠক

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে পৃথক নির্বাচন প্রথা বহাল রাখার আবেদন করেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। গান্ধী শত চেষ্টা করেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের স্বমতে আনতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হলে সংবিধান রচনা করা সম্ভব নয়। ভারতবাসী এ বিষয়ে একমত হলেই তবে ব্রিটিশ সরকারের কিছু করণীয় আছে।

গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন বসে ১৯৩২ সালের ১৭ নভেম্বর। ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। আগের দুটি অধিবেশনের তুলনায় অনেক কম প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। এতে মাত্র ৪৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেসও এ অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠায়নি। তিনটি বিষয় এ সম্মেলনে গুরুত্ব লাভ করে, যথা- ১. কী কী শর্তের ভিত্তিতে রাজ্যগুলো ফেডারেশনে যোগ দেবে, ২. অবশিষ্ট ক্ষমতার বণ্টন এবং ৩. ব্রিটিশ শাসনের গ্যারান্টি। প্রতিনিধিবর্গের অনেক দাবি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ১২ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

টপিক ১২: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ১৯৪৭সালে ভারত বিভক্তির সময়ও এ আইন কার্যকর ছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানে নিজেদের পৃথক সংবিধান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এ আইন সংশোধিত আকারে বলবৎ থাকে।

ব্রিটিশ সরকার তিনটি গোলটেবিল বৈঠক আলোচনা করেও শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোনো সমাধান করতে না পারায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড আইনসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে স্বীয় সিদ্ধান্তে এক সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রকাশিত শ্বেতপত্রের আলোকে পরের বছর ভারতের জন্য একটা নতুন সংবিধানের খসড়া প্রকাশিত হয়। এ খসড়ার ভিত্তিতেই ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় হাউসে ভারতের শাসনকার্যের জন্য একটা নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। এটাই ১৯৩৫ সালের বিখ্যাত ভারত শাসন আইন। ভারত শাসনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন ছিল যা এ আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

১. এ আইনে স্থির হয় যে ভারতের প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে।

২. যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার গভর্নর জেনারেল ও তার মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকবে। মন্ত্রীগণ আইনসভার মধ্য থেকে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নিয়োজিত হবেন এবং তাঁরা আইনসভার নিকট দায়ী থাকবেন।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্য সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত-এ দুভাগে বিভক্ত হবে। সংরক্ষিত বিষয়গুলো যেমন দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্ম ও আদিবাসী সম্পর্কীয় বিষয় ইত্যাদি পরিচালনার দায়িত্ব গভর্নর জেনারেল ও তিনজন উপদেষ্টার হাতে ন্যস্ত থাকবে। হস্তান্তরিত বিষয়গুলো যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হবে।

৪. ক্ষমতার এ বণ্টন দ্বারা কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়।

৫. এ আইনে গভর্নর জেনারেলকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাও দেয়া হয়। তিনি ইচ্ছা করলে আইনসভার পরামর্শ না নিয়েই মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে পারবেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

৬.যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যগুলোর যোগদান স্বেচ্ছামূলক করা হয়।

৭. আইনে এটাও বলা হয় যে, ফেডারেল আইনসভার উচ্চ পরিষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক দেশীয় রাজ্যগুলো দ্বারা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে না।

৮. ১৯৩৫ সালের আইনে কেন্দ্রে একটা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা ছিল। উচ্চকক্ষটি রাষ্ট্রসভা এবং নিম্নকক্ষ ব্যবস্থা পরিষদ নামে অভিহিত হবে স্থির হয়। মোট এগারোটি গভর্নর শাসিত প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা এবং অবশিষ্ট পাঁচটিতে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হয়।

৯. ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অনুযায়ী কেন্দ্রের মতো বিভিন্ন প্রদেশেও মুসলিম ও অনুন্নত শ্রেণির জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

১০. এ আইনে প্রদেশগুলোতে দ্বৈত শাসনের পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হয়। নতুন আইন অনুযায়ী প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রধান হবেন একজন গভর্নর। জনগণের নির্বাচনে গঠিত হবে একটি আইনসভা। ঐ আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে গভর্নরকে পরামর্শ দান ও সাহায্যের জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। আইন-শৃঙ্খলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গভর্নরের এখতিয়ারে থাকবে। মন্ত্রিগণ তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকবেন প্রাদেশিক আইনসভার নিকট। গভর্নরকে বিশেষ ক্ষমতাও দেয়া হয়। সে ক্ষমতা বলে তিনি ইচ্ছা করলে আইনসভা ও মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে পারবেন। তাছাড়া যে কোনো অর্ডিন্যান্স বা জরুরি আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও তার ছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

১১. ভারত সচিবের কাউন্সিল এ আইনের বলে বিলুপ্ত হয়।
১২. বার্মাকে ভারত থেকে আলাদা করা হয়।
১৩. সিন্ধু ও উড়িষ্যা নামে দুটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়।
১৪. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূরকরূপে এ আইনে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

ফলাফল

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা কার্যকর করা হয়নি। ভারত কোনো রাজনৈতিক দল ও আইনে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কংগ্রেস এ আইনের তীব্র নিন্দা করে। জওহরলাল নেহেরু একে 'দাসত্বের এক নতুন অধ্যায়' বলে অভিহিত করেন। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ অভিযোগ করেন যে, এ আইনে স্বায়ত্তশাসনের স্বাভাবিক অগ্রগতির কোনো লক্ষণ নেই। হিন্দু মহাসভাও এ আইন সমর্থন করেনি। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তবে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধানগুলো সমর্থন করেন। অবশ্য এ আইনে প্রাদেশিক গভর্নরকে এত ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যে এর ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে প্রকৃত দায়িত্বশীল বলা যায় না।

উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। লাহোর প্রস্তাবের মধ্যদিয়েই এই দাবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রস্তাবের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। তবে পরবর্তীতে বিনা কাউন্সিলে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন হলে পূর্ব বাংলায় অসন্তোষ দেখা দেয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ১৩ লাহোর প্রস্তাব

টপিক ১৩: লাহোর প্রস্তাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

লাহোর প্রস্তাব

পটভূমি

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ১৯৩৭ সালে কার্যকর করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু কংগ্রেস মুসলিম লীগের সাথে কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনা ছাড়াই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মন্ত্রিসভা গঠন করে। এতে মুসলমানগণ শঙ্কিত হন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এ সময় দাবি করেন যে, ভারতে দুটি শক্তির অস্তিত্ব লক্ষণীয়- একটি সরকার, অপরটি কংগ্রেস। অন্য কোনো দলের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতে নারাজ। তার এ মন্তব্য মুসলমান নেতাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এ কে ফজলুল হক ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের পেছনে রাজনৈতিক ধারার একটা পটভূমি রয়েছে। এ প্রস্তাবে যে স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমির দাবি করা হয়েছে অনুরূপ একটা প্রস্তাব ১৯৩০ সালে কবি আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল তার একটি ভাষণে উল্লেখ করেন। তিন বছর পর ১৯৩৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোর জন্য 'পাকিস্তান' নামের উদ্ভাবন করেন।

লাহোর প্রস্তাব

পটভূমি

কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের
জন্য পৃথক কোনো রাষ্ট্রের কথা ভাবেননি। কংগ্রেস নেতাদের দম্ভোক্তি তাকে আহত করে এবং রাজনীতির নতুন কৌশল তিনি অবলম্বন করেন। যদিও তিনি কোনো সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন না। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর যেসব প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, সেখানে তাদের কার্যকলাপ মুসলমানদেরকে আহত করে। তারা বুঝেছিল সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিন্দুদের শাসনাধীনে কখনো বাস্তব রূপ নেবে না। এ পরিস্থিতিতে ১৯৩৯ সালে জিন্নাহ তার বিতর্কিত ও বহুল আলোচিত 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' ঘোষণা করেন। পরবর্তী বছর লাহোরে মুসলিম লীগের ঘোষণায় এরই প্রতিধ্বনি পুনর্ব্যক্ত হয়।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে বাংলার নেতা ও প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে বলা হয় যে, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর বা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যদি এটি নিম্নবর্ণিত মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। যথা:

লাহোর প্রস্তাব

পটভূমি

১. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে প্রয়োজনীয় রদবদলের মাধ্যমে পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে;

২. ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে এ ধরনের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহে স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করতে হবে এবং

৩. এভাবে গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো থাকবে স্ব-শাসিত ও সার্বভৌম। লাহোর প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার রক্ষাকল্পে সংবিধানে প্রয়োজনীয় রক্ষা-কবচ রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক স্বাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব অর্জনই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য।

লাহোর প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া ছিল। পণ্ডিত, নেহেরু এ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি গঠন অবান্তর বলে আখ্যায়িত করেন। মহাত্মা গান্ধীও তার লেখায় এর সমালোচনা করেন এবং ভারত বিভক্ত করাকে পাপের সমতুল্য বলে মন্তব্য করেন। বর্ণবাদী হিন্দুরা এ প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত বিভক্তি পছন্দ না করলেও ১৯৪৭ সালে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার দাবি তোলে। এটা অনস্বীকার্য যে, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাবের প্রভাব অপরিসীম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ১৪ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা

টপিক ১৪: মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে না পারলে ভারতে ক্লিপস মিশন পাঠানো হয়। কেননা এ সময় ইংল্যান্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ভারতবাসীর সমর্থন তার জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইন্সটন চার্চিল তার মন্ত্রিসভার সদস্য স্ট্যাফোর্ড ক্লিপসকে ভারতে পাঠান। ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ ক্লিপস দিল্লিতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগসহ অন্যান্য দলের সাথে আলোচনা করে একটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করেন। যা 'ক্রিপস মিশন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। কিন্তু ক্রিপস মিশন পরিকল্পনা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ে প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন শুরু করলে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার আয়োজন করা হয়।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা

ক্লিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৬ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সিমলায় একটি বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু এই বৈঠকও ব্যর্থ হয়। সিমলা বৈঠকের সূত্র ধরে ১৯৪৬ সালে ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভারতে আসে। লরেন্স ছাড়া এই প্রতিনিধি দলের অন্য দুই সদস্য ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লিপস ও এ.ভি. আলেকজান্ডার। এই মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে আলোচনার পর ১৯৪৬ সালের মে মাসে ভারতের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে। ইতিহাসে এটিকে 'মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা' বা 'ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা' নামে অভিহিত করা হয়।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস

লাহোর প্রস্তাব

মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবসমূহ

মূলত ভারত উপমহাদেশকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব ছিল মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনায়। তিন স্তরবিশিষ্ট ছিল এই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা। এগুলো হচ্ছে-

১. প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে;

২. একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠন করা হবে- যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো;

৩. ভারতীয় প্রদেশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে-

'ক' গ্রুপে থাকবে, মাদ্রাজ, বোম্বে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা,

'খ' গ্রুপে থাকবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু

'গ' গ্রুপে থাকবে বাংলা ও আসাম। সিদ্ধান্ত হয় প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করা হবে। মন্ত্রিমিশন প্রস্তাব পেশের পাশাপাশি শর্ত জুড়ে দিয়েছিল যে, পরিকল্পনার পুরোটিই গ্রহণ করতে হবে- অংশবিশেষ নয়। ভারতীয় ইউনিয়নের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ এবং মুদ্রা বিভাগের দায়িত্ব। অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। এছাড়াও বলা হয় কেন্দ্রীয় সংসদে মোট ৩৮৫টি আসনের মধ্যে ৭৮টি মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করা হয়। পরিকল্পনায় এই সুযোগ রাখা হয় যে, কোনো গ্রুপ ইচ্ছা করলে দশ বছর পর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে।

লাহোর প্রস্তাব

মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবসমূহ

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার ভিতর উভয় দলই নিজেদের মতো করে সুবিধা খুঁজতে থাকে। এককেন্দ্রিক সরকার গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেসের ভালো লাগে। কারণ এর ভিতর দিয়ে তারা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেখতে পায়। অন্যদিকে গ্রুপিং ব্যবস্থা উৎসাহ দেয় মুসলিম লীগকে। কারণ এই ব্যবস্থায় সম্ভব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি বাস্তবায়ন। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গ্রুপগুলো ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বলে লীগ নেতারা মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে নেয়। যদিও পরবর্তী সময় পুরো পরিকল্পনাকেই প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে প্রথম থেকেই কংগ্রেসের অসহযোগিতার ফলে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। মুসলিম লীগ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলে কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। কংগ্রেসের এরূপ সিদ্ধান্তের কারণে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের আহ্বান জানায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ১৫ ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন

টপিক ১৫: ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন

This Topic is important for

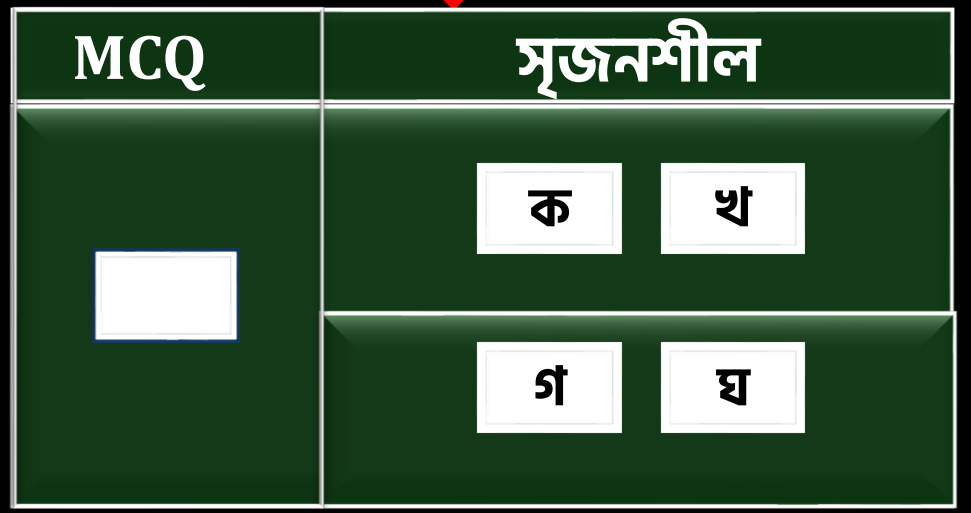

১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন

১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন ভারতবর্ষে ১৯০ বছরের ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে সর্বশেষ আইনগত পদক্ষেপ। এ আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতকে দুটো ডোমিনিয়নে বিভক্ত করার মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রদান করে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় ১৯৪৭ সালে। একটি আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এই হস্তান্তর সম্পন্ন করা হয়। এটিই ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে পরিচিত।

লাহোর প্রস্তাব

পেক্ষাপট

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা নেমে আসে। এ সময়ের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল ভারত স্বাধীনতা আইনটি। কংগ্রেসের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার জন্যই ব্যর্থ হয়েছিল এই পরিকল্পনা। এই ঘটনা মুসলিম লীগকে আহত করে। লীগ দাবি করে যেহেতু তারা পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছে, তাই সরকারের উচিত লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সম্মতি দেওয়া। কিন্তু বিষয়টি একদলীয় হয়ে যাচ্ছে বলে বড়লাট ওয়াভেল লীগের দাবির প্রতি সম্মতি জানাতে পারেননি। লীগের কাছে সরকারের এই মনোভাব চুক্তি ভঙ্গ বলে মনে হয়। এ প্রেক্ষিতে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সৃষ্টি হয় দূরত্ব।

মুসলিম লীগ এবার নিজের মতো করে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ১৯৪৬ সালে জুলাই মাসে বোম্বাইয়ে একটি সম্মেলন ডাকে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (ডাইরেক্ট এ্যাকশন) শুরু করবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট দেশব্যাপী 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের ডাক দেয়া হয়। মুসলিম লীগ নেতা অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ব্রিটিশ সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় বসে তবে বাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এবং পাল্টা সরকার গঠন করবে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনো রাজস্ব দেবে না এবং কেন্দ্রের সাথে কোনো সম্পর্কও রাখবে না।

লাহোর প্রস্তাব

পেক্ষাপট

এদিকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের দিন ঘনিয়ে আসে। বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়াদী ও মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশেম। তারা জনমত গঠন করতে থাকেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের দিন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। এ দাঙ্গা কলকাতায় শুরু হলেও ক্রমে বাংলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থার মারাত্মক অবনতি হতে থাকলে ব্রিটিশ সরকার শেষ রক্ষার চেষ্টা করে। তারা ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা ঘোষণা করে। সুতরাং কীভাবে দেশ বিভক্ত করা হবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে তার জন্য একটি নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার লর্ড ওয়াভেল এর পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট করে পাঠান।

লাহোর প্রস্তাব

লর্ড মাইন্টব্যাটেন ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি

বড়লাটের ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রথম দিল্লিতে আসেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি ঘোষণা দেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। মাউন্টব্যাটেনের সহানুভূতি ছিল কংগ্রেসের প্রতি। কংগ্রেসের সমর্থক হিসেবে তিনি অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এভাবে লীগের সাথে আপোস করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস লীগের দাবি মেনে নিয়ে ভারত বিভক্ত করতে রাজি হয়। কিন্তু এতে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করা হয় যা লীগের পক্ষে মানা সম্ভব হয়নি।

লাহোর প্রস্তাব

বসু-সোহরাওয়ার্দীর অখণ্ড বাংলা প্রস্তবা

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য যখন তীব্র হচ্ছিল তখনই বাংলার কতিপয় নেতা অখণ্ড বাংলা গড়ার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। অখন্ড বাংলার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বেশ ক'জন প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাও এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তারা হচ্ছেন- শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায় প্রমুখ। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশেমও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। শরৎ চন্দ্র বসুর সক্রিয় সমর্থনের কারণে প্রস্তাবটি 'বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব' নামে পরিচিত হয়। বাংলার এই দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ বুঝেছিলেন, কংগ্রেস ও লীগের কাছে দলীয় স্বার্থই বড়। বাংলার স্বার্থের কথা কখনই তারা বিশেষ বিবেচনায় রাখবে না। তাই অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব ঘোষণা ও বিশ্লেষণ করেন শরৎচন্দ্র বসু ও সোহরাওয়ার্দী। তাদের মতে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখা সম্ভব।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

লাহোর প্রস্তাব

বসু-সোহরাওয়ার্দীর অখণ্ড বাংলা প্রস্তবা

এই প্রস্তাবের ভিতর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ মহৎ প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এবারও প্রথম বিরোধিতা আসে কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই। কংগ্রেসের অবাঙালি ও রক্ষণশীল সদস্যরা প্রচণ্ড বিরোধিতায় মেতে ওঠে। কংগ্রেস এবার অখণ্ড বাংলার বদলে পাকিস্তান দাবিকেই মেনে নেয়। এভাবে ভারত বিভাগের প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

লাহোর প্রস্তাব

ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান ধারাসমূহ

১. ব্রিটেনের ভারতীয় উপনিবেশটি 'ভারতীয় ইউনিয়ন' এবং 'পাকিস্তান' নামে দুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ডোমিনিয়নে বিভক্ত হবে এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে এই ডোমিনিয়নদ্বয়ের স্বাধীনতা কার্যকর হবে।

২. বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভক্ত হয়ে দুই স্বাধীন ডোমিনিয়নে যুক্ত হবে।

৩. ব্রিটেনের রানির প্রতিনিধির প্রতীক হিসেবে উভয় ডোমিনিয়নে দুইজন গভর্নর জেনারেল নির্বাচিত হবেন এবং এদের হাতে ডোমিনিয়নদ্বয়ের কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা হবে।

৪. উভয় ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত নির্বাচিত আইন পরিষদসমূহ স্বাধীনতা লাভের পর সংবিধানসভার মর্যাদা লাভ করবে।

৫. ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর থেকে ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং এই রাজ্যগুলো তাদের ইচ্ছামতো ভারতীয় ইউনিয়ন কিংবা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে।

লাহোর প্রস্তাব

ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান ধারাসমূহ

৬. ব্রিটেনের সম্রাটের 'Emperor of India' উপাধিটি বিলুপ্ত হবে। ব্রিটিশ সরকারের ভারতের জন্য সৃষ্ট Secretary of the State পদবি এবং তার অফিস বিলুপ্ত হবে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ওপর ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হবে। এই আইন পাসের সময় থেকে ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় ইউনিয়ন এবং পাকিস্তানের ওপর থেকে সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হবে। ব্রিটিশ সরকারের ভারতের পক্ষে করা সকল চুক্তি, সমঝোতা অকার্যকর হবে।

৭. ভারতীয় ইউনিয়ন তার জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে হিন্দুদের দ্বারা এবং পাকিস্তান তার জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে মুসলিমদের দ্বারা শাসিত হবে।

৮. পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং চিফ কমিশনার শাসিত বেলুচিস্তান নিয়ে হবে পাকিস্তান ডোমিনিয়ন এবং বাকি সকল অঞ্চল নিয়ে হবে 'ভারতীয় ইউনিয়ন (বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, দেশীয় রাজ্যসমূহ প্রভৃতির ভাগ্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত)।'

লাহোর প্রস্তাব

ভারত স্বাধীনতা আইনের ফলাফল

ভারত স্বাধীনতা আইনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আগেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কথা বলা হয়েছে। এই ভারত শাসন আইনকেই অনেক পরিবর্তন ও সংস্কার করে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনে রূপান্তর করা হয়। এ আইনের তিনটি ফলাফল লক্ষ করা যায়-

১. পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি ভিন্ন ডোমিনিয়ন স্থাপন করা হয় এবং এই ডোমিনিয়ন দুটি ছিল সমান মর্যাদা সম্পন্ন ও স্বায়ত্তশাসিত;

২. ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত আইনসভা গণপরিষদের মর্যাদা লাভ করে। এই গণপরিষদের ওপর দায়িত্ব ছিল দেশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা।

৩. পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। ডোমিনিয়ন আইন সভায় যে সব আইন গৃহীত হতো তাতে স্বাক্ষর দানের পূর্ণ অধিকার থাকত গভর্নর জেনারেলের।

লাহোর প্রস্তাব

হিন্দু-মুসলিম বিরোধের প্রতিক্রিয়া

আগের পাঠে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। ভারত বিভাগের পূর্বে প্রচুর রক্ত ঝরেছিল এদেশের হিন্দু ও মুসলমানের। ১৯৪৭ সালের আগস্টেই প্রচুর দাঙ্গার খবর আসতে থাকে। হতাশ হয়ে পড়েছিল এ দেশবাসী। এ সময়েই হঠাৎ আশার আলো দেখা যায়। নতুন প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসেন দু'জন ব্যক্তি। এদের একজন মহাত্মা গান্ধী এবং অপরজন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তারা খুঁজে পেয়েছিলেন সঙ্কটের উৎস। দেশ বিভাগ কমিটিগুলো কীভাবে সীমানা নির্ধারণ করবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত তৈরি করছিল। এ প্রসঙ্গে রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে খবর প্রচারিত হচ্ছিল তাতে উত্তপ্ত হচ্ছিল চারপাশ। হিন্দু-মুসলিম উভয়েই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ফলে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ বাড়ে। দাঙ্গাও বিস্তার লাভ করতে থাকে। সরকার সে দাঙ্গা থামাতে পারেনি। সে অসাধ্য সাধন হয়েছিল গান্ধীর নেতৃত্বে। দাঙ্গার কথা ভুলে গিয়ে জনতার মধ্য থেকে স্লোগান উঠতে থাকে 'হিন্দু-মুসলমান এক হও', 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই'। এভাবে শান্তি ও সম্প্রীতির আবহাওয়া ক্রমে বিস্তার লাভ করে।

লাহোর প্রস্তাব

হিন্দু-মুসলিম বিরোধের প্রতিক্রিয়া

দাঙ্গা ব্যাপকতা লাভ করেছিল বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশে। কারণ দুটি প্রদেশই সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়েছিল। তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় দাঙ্গা দমনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মহাত্মা গান্ধী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সফরে এলে সোহরাওয়ার্দী তার সাথে দাঙ্গা কবলিত এলাকায় সফর করেন। পাকিস্তান ও ভারতের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ হারায় ২০ লাখ মানুষ। ভিটেমাটি ছাড়া হয় ১৫ লাখ মানুষ। সূত্র: দি ডন, করাচি]

লাহোর প্রস্তাব

ভারত স্বাধীনতা আইনের তাৎপর্য

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন বিভিন্ন কারণে সমালোচিত হলেও এ আইনের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এ আইন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নিম্নলিখিত কারণে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের গুরুত্ব অপরিসীম:

১. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের পথে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশেষ পদক্ষেপ।

২. এ আইনের মাধ্যমে সুদীর্ঘ প্রায় ১৯০ বছরের (১৭৫৭-১৯৪৭) ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

৩. এ আইন দ্বারা গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিলুপ্ত করায় ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তানে সংসদীয় ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

৪. সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ বা বিনা রক্তপাতে এ আইন দ্বারা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ইতিহাসের গতিপথ ধরে নব নব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে এ দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।

ভারত স্বাধীনতা আইনের তাৎপর্য

৫. এ আইন উপমহাদেশের জনগণের কৃষ্টি, সভ্যতা, সাহিত্য, জীবনযাত্রা প্রণালি ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করে। ফলে শুভ সূচনা হয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আরেকটি অধ্যায়ের।

৬. এ আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এ আইনের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ১৬ পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

টপিক ১৬: পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন এ উপমহাদেশের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দলিল। এ আইন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে যা সূচিত হয়, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনে তার সমাপ্তি ঘটে। ব্রিটিশ রাজ্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে ভারত এবং পাকিস্তান এ দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে এ আইনে।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দিল্লিতে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে এ পরিষদ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর অংশ হিসেবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। গণপরিষদে জওহরলাল নেহেরু মন্তব্য করেছিলেন, 'Long years ago we made a destiny and how the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially.' এভাবেই প্রায় ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় এবং ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং ভারত ইউনিয়নের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন লিয়াকত আলী খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের ইতিহাসে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়ের, নতুন যুগের। নব নব প্রেরণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপমহাদেশের দুটি দেশ নতুনভাবে তাদের যাত্রা শুরু করে।

পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে ভাইসরয় ১৩ আগস্ট করাচি পৌছেন। বিকালের আনুষ্ঠানিক ভোজ সভায় জিন্নাহ দীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাইসরয়ও সেখানে তার বক্তব্য পাঠ করেন। ১৪ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ভাইসরয় পাকিস্তান সৃষ্টিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন। এই দিন বিকালেই দিল্লিতে ফিরে আসেন ভাইসরয়।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা থেকেই দিল্লিতে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। স্বাধীনতার উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ দিল্লির দিকে ছুটে আসতে থাকে। ১৫ আগস্ট নেহেরু ভারতীয় বিধান সভার উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এদিন স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে আনন্দে উদ্বেল হয়ে পড়ে দিল্লি তথা ভারত। এভাবে, উপমহাদেশের ইতিহাসে দীর্ঘদিনের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ১৭ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

টপিক ১৭: অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

This Topic is important for

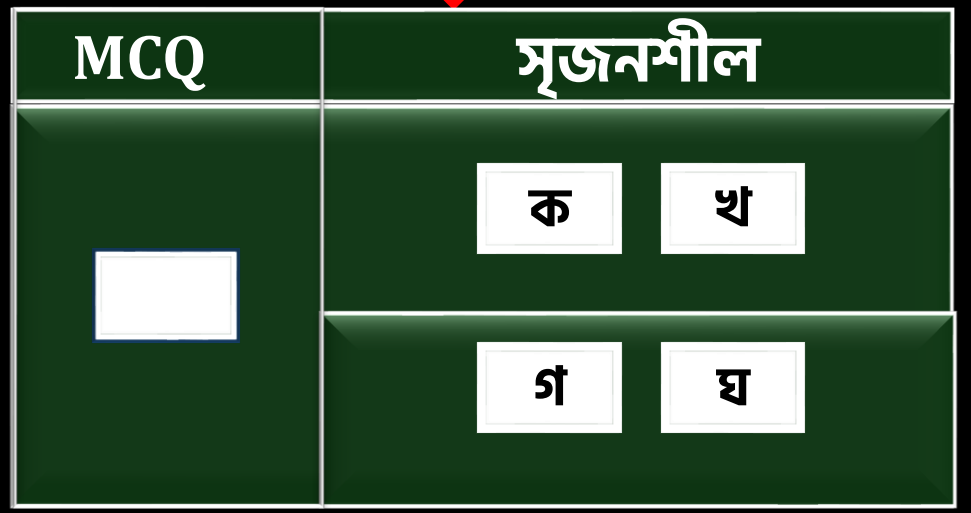

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

ইলবার্ট বিল

ইউরোপীয় অপরাধীদেরকে বিচার করার জন্য ভারতীয় বিচারকদের ক্ষমতা দিয়ে লর্ড রিপন যে আইন পাস করেন, তা 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত। লর্ড রিপনের শাসনামলের অন্যতম একটি সংস্কার হলো 'ইলবার্ট বিল' প্রণয়ন। ইলবার্ট বিলের মাধ্যমে লর্ড রিপন ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য নিরসনে সচেষ্ট হন। ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসারে কোনো ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ইতোপূর্বে ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করতে পারতেন না। তাই তিনি 'ইলবার্ট বিল' প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতীয় বিচারকদের সেই ক্ষমতা প্রদান করেন। ইউরোপীয়রা এ আইনকে অপমানজনক মনে করে এর বিরোধিতা করে।

বঙ্গভঙ্গ

১৮৫৪ সালের পরিকল্পনা ও ১৯০১ সালের প্রস্তাবের ভিত্তিতে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। ভারতের প্রশাসনিক বিন্যাস সাধন, "ভাগ কর ও শাসন কর" নীতির বাস্তবায়নে ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন। তবে ভারতের হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গকে সহজভাবে মেনে নেয়নি। তারা বিভিন্ন আন্দোলন করতে থাকে এর বিরুদ্ধে। অপরদিকে, নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায় এবং নিজেদের দাবি আদায়ে মুসলিম লীগ গঠন করে। তবে কংগ্রেসের আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে।

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

লাহোর প্রস্তাব

হিন্দু-মুসলিম জনগণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তার মতে, ভারতে হিন্দু-মুসলমান দুটি পৃথক জাতি। সুতরাং মুসলমানদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং সুন্দর জীবন যাপনের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র থাকা প্রয়োজন। তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবটি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

আলীগড় আন্দোলন

স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের উদ্ধার ও পুনর্জাগরণ। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ না করে মুসলমানরা সবক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায়ের এ শোচনীয় দুরবস্থা থেকে তাদেরকে পরিত্রাণ করা সৈয়দ আহমদ জরুরি বলে মনে করেন। এ লক্ষ্যে আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে সৈয়দ আহমদ ইংরেজ সরকার ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে ব্রতী হন। মোটকথা, মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভাবধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে আলীগড় আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ১৮ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১.মহারানি ভিক্টোরিয়া কত খ্রিষ্টাব্দে রাজকীয় ঘোষণা প্রদান করেন? [সকল বোর্ড ২০২২]

ক. ১৮৫৭ খ. ১৮৫৮

গ. ১৮৬২ ঘ. ১৮৬৪

২."Bengal Municipal Act" কী? [সকল বোর্ড ২০২১]

ক. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক আইন খ. রাজস্ব সংক্রান্ত আইন

গ. শিক্ষা সংক্রান্ত আইন ঘ. সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি

৩.কে ইলবার্ট বিল প্রণয়ন করেন? সকল বোর্ড ২০২২।

ক. লর্ড কার্জন খ. লর্ড লিটন

গ. লর্ড রিপন ঘ. লর্ড মিন্টো

৪. ঐতিহাসিক কীর্তিসমূহ সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য লর্ড কার্জন কোনটি প্রতিষ্ঠা করেন? [সকল বোর্ড ২০২১]

ক. ইতিহাস বিভাগ খ. প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘর

গ. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ঘ. সংরক্ষণাগার

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৫.আলীগড় আন্দোলনের উদ্যোক্তা কে? সকল বোর্ড ২০২১।

ক. স্যার সৈয়দ আহমদ খ. সৈয়দ আমীর আলী

গ. নওয়াব আব্দুল লতিফ ঘ. স্যার সলিমুল্লাহ

৬.কোন সম্প্রদায় বঙ্গ-ভঙ্গকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি? সকল বোর্ড ২০২১।

ক. মুসলমান খ. হিন্দু

গ. খ্রিষ্টান ঘ. বৌদ্ধ

৭.বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অবশেষে কী ধরনের পথ অবলম্বন করেছিল? সকল বোর্ড ২০২৩; ক. সাম্যবাদের খ. গণআন্দোলনের

গ. সন্ধি চুক্তির ঘ. সন্ত্রাসবাদের

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৮. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়- সকল বোর্ড ২০২৩/

i. অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের প্রচেষ্টায়

ii. লর্ড ডাফরিনের পৃষ্ঠপোষকতায়

iii. কতিপয় শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৯. মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য হলো- সকল বোর্ড ২০১৮, ২০১৬/

i. ব্রিটিশদের বিরোধিতা করা

ii. ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব পোষণ করা

iii. মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. I　　খ. i ও ii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

১০.ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ফলাফল- সকল বোর্ড ২০২১]

i. ভারত বিভক্তি

ii. ইংরেজ শাসনের অবসান

iii. মুসলিম শাসনের পুনর্জাগরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৪ ও ৪৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' দেশের শাসক প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দেশকে বিভক্ত করেন। এতে দেশের এক অংশের জনগণ বিরোধিতা করে এবং গুপ্তহত্যা, দাঙ্গা ও বর্জন নীতি গ্রহণ করে।

১১. উদ্দীপকের ঘটনা ভারতীয় উপমহাদেশের কোন আন্দোলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত?

ক. ফরায়েজি আন্দোলন খ. স্বদেশী আন্দোলন

গ. আলীগড় আন্দোলন ঘ. অসহযোগ আন্দোলন

১২. উদ্দীপকে প্রতিফলিত আন্দোলন ছিল-

ক. অর্থনৈতিক খ. সামাজিক

গ. ধর্মীয় ঘ. সাংস্কৃতিক

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – ইংরেজ উপনিবেশ শাসনঃ ব্রিটিশ আমল

টপিক – ১৯ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রানি এলিজাবেথের সিংহাসনে আরোহণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজপ্রাসাদের একটি অংশ সাময়িক সময়ের জন্য দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। 'ক' সাহেব ও তার স্ত্রী রাজপ্রাসাদে বেড়াতে গেলে তারা দেখতে পান মহারানি ভিক্টোরিয়ার একটি ছবির নিচে লেখা 'ভারত সম্রাজ্ঞী'। স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে 'ক' সাহেব বলেন, ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এক রাজকীয় ঘোষণায় ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষের শাসনভার মহারানি ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করেন। [ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২/

ক. ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট কে ছিলেন?

খ. ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কারণ কী ছিল?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের মহারানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাটি ব্যাখ্যা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে জার্মানি দুটি অংশে বিভক্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ দুর্বল হয়ে পড়লে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে একটি চুক্তির মাধ্যমে জার্মানির দুই অংশের একত্রীকরণ সম্পন্ন হয়।

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩]

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. ইলবার্ট বিল কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'Divide and Rule' ব্রিটিশ শাসকদের কৌশল-পাঠ্য বিষয়ের নিরিখে বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

'ক' রাষ্ট্রে বহুদিন ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বসবাস করে আসছে। এক সময় ঐ অঞ্চলে একটি বড় বিদ্রোহ সংঘটিত হলে শাসকবর্গ পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়কে দায়ী করে। ঐ সময়ে সেখানে দোষী সম্প্রদায়ের ত্রাণকর্তা হিসেবে একজন মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি তার সম্প্রদায়কে সকল গোঁড়ামি ত্যাগ করে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শাসকের সাথে দূরত্ব কমিয়ে আনার পরামর্শ দেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন সভা, সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা গড়ে উঠে।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]

ক. কত সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়?

খ. ইলবার্ট বিল বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের মনীষীর সাথে তোমার পঠিত কোন মনীষীর কাজের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ভারতীয় মুসলমানদের চেতনা বিকাশে তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও আন্দোলনের অবদান সর্বাধিক-উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU